50

NORTH BENGAL UNIVERSITY EMPLOYEES' ASSOCIATION

1966-2015

GOLDEN JUBILEE YEAR

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ

২০১৫ - ২০১৬

সংহতি

সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

North Bengal University Employeesí Association

সংহতি

সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা
২০১৫–২০১৬

সম্পাদনা

শ্রী পরিমল চন্দ্র রায়

এবং

শ্রী অনুপচন্দ্র সিংহ রায়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং ৭৩৪০১৩

রেজিঃ নং ২১১৫৪

সংহতি ঃ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির মুখপাত্র

প্রকাশক ঃ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং ৭৩৪০১৩

প্রকাশকাল ঃ
১ম ঃ ০৯/১০/২০১৫
২য় ঃ ২৬/১১/২০১৫

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রী ইন্দ্রনীল রায়, শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী ও শ্রী দিল্ বাহাদুর থাপা

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রী নির্মল চন্দ্র
এবং
শ্রী ইন্দ্রনীল রায় ও শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী

মুদ্রণ ঃ
মুদ্রণ বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং ৭৩৪০১৩

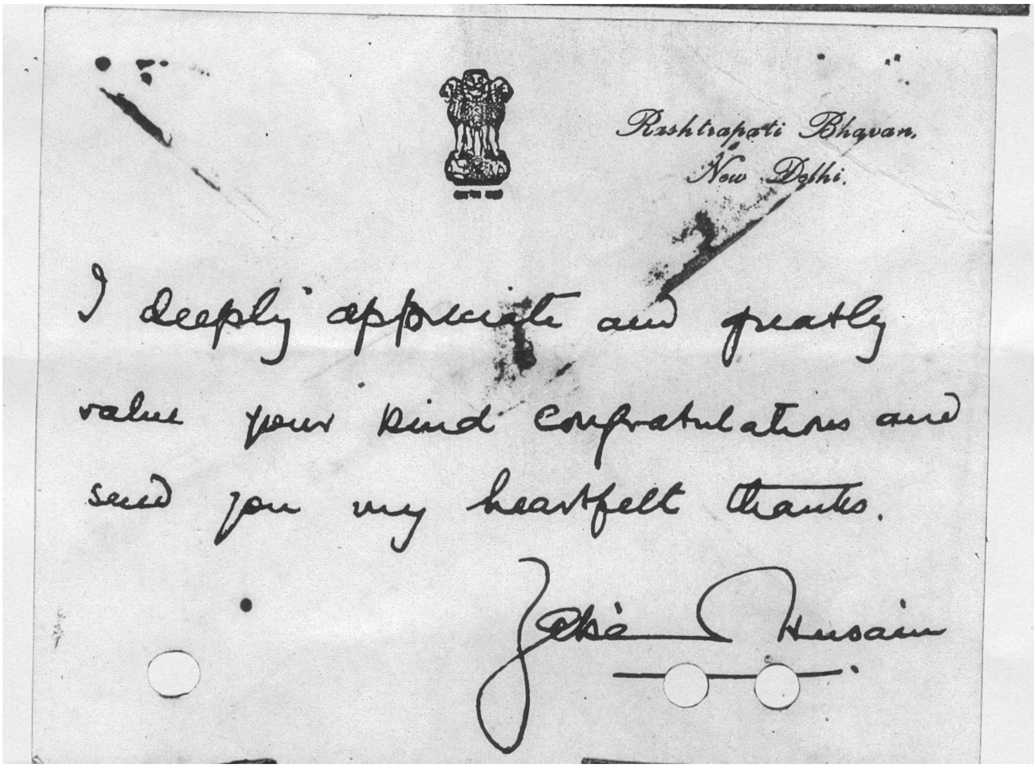

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi.

I deeply appreciate and greatly value your kind congratulations and send you my heartfelt thanks.

Zakir Husain

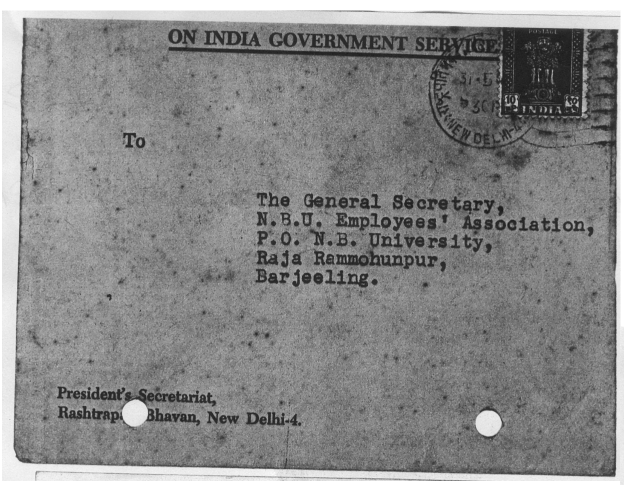

ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

To

The General Secretary,
N.B.U. Employees' Association,
P.O. N.B. University,
Raja Rammohunpur,
Barjeeling.

President's Secretariat,
Rashtrap Bhavan, New Delhi-4.

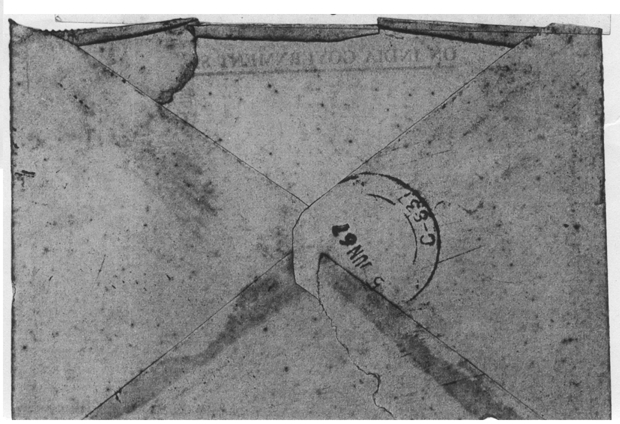

The message was received from the former Hon'ble President of India Dr. Zakir Hossain on 05/05/1967.

Professor Dr. Somnath Ghosh
_M.Sc., Ph.D_
Vice-Chancellor
University of North Bengal

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Web site: http://www.nbu.ac.in
E-Mail: nbuvc@nbu.ac.in

ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

30th September, 2015.

MESSAGE

I am happy to learn that North Bengal University Employees' Association is going to publish the yearly magazine *"Sanghati"* to commemorate the celebration of the Golden Jubilee Year of the North Bengal University Employees' Association.

I hope the publication of this magazine will provide opportunities among the employees to share their views for development and strengthening the unity and harmony amongst all.

On this occasion, I extend my greetings to all the members of the North Bengal University Employees' Association and wish this magazine will be useful to all.

Somnath Ghosh
30.9.2015
Prof. Somnath Ghosh
Vice-Chancellor

Sri Sumon Chatterjee
General Secretary
NBU Employees' Association
University of North Bengal

P.O. North Bengal University, Raja Rammohunpur, Dt. Darjeeling, West Bengal, India, PIN - 734 013
Phone : (0353) 2776 366(O), (0353) 2776 308(R), Fax : (0353) 2699 001

RAIGANJ UNIVERSITY

P.O. RAIGANJ, DIST. UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL

PIN - 733134, INDIA

Phone Nos. -
Chamber : (03523) 242570
Residence : (03523) 242577
Mobile : 9474090158
Fax No. : (03523) 242580
e-mail - anilbhuimali@rediffumil.com

रायगञ्ज युनिभार्सिटि
तमसो मा ज्योतिर्गमय
ESTD. - 2015

Professor Anil Bhuimali
Vice-Chancellor

Ref. No. 5/M/RGU/VC *Date* 07.10.2015

Message

I am extremely happy to learn that on the occasion of the celebration of the Golden Jubilee Year of North Bengal University Employees' Association, you are going to bring out the special issue of 'SANGHATI', a yearly magazine published by your association. I believe that this issue will be able to deliver the views expressed by the writers in their writings. I am eagerly waiting for a copy of it. I convey my best wishes for its success.

A. Bhuimali
(Prof. A. Bhuimali)
Vice-Chancellor
Raiganj University
Uttar Dinajpur

To
Shri Sumon Chatterjee
Secretary, North Bengal University Employees' Association,
University of North Bengal,
Darjeeling.

সভাপতির বার্তা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি সুদীর্ঘ সংগ্রামী যাত্রাপথ পেরিয়ে তার ৫০ বছরে পদার্পণ করলো। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এই সমিতির গোড়াপত্তন হয়েছিল কর্মচারীদের নিরাপত্তার অভাববোধ ও প্রয়োজনীয় তাগিদ থেকেই। সমিতির এই দীর্ঘ লড়াইকে কেন্দ্র করে সমিতির একটি পতাকাতলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সদস্যরাই তাদের পরিশ্রম, যুক্তি, অভিজ্ঞতার দ্বারা কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন নেতৃত্বদের কর্মচারী সমিতির উপর তাদের অধিকার, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, আস্থা, নির্ভরতা, বিশ্বাস সর্বপরি ভালোবাসা আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। আমরা অর্থাৎ বর্তমান নেতৃত্ব সৌভাগ্যবশতই সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করার সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং সমিতির এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সমিতির প্রথম সাধারন সম্পাদক থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাক্তন নেতৃত্ববৃন্দদের সম্বর্ধনা দিতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে সমিতির সদস্য/সদস্যাদের কাছে চিরঋনী। আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির অনুপ্রেরনায় আমরা সত্যিই অনুপ্রানিত। আপনাদের আত্মত্যাগ ও লড়াই একথাই প্রমান করে ক্ষমতার আক্রমনের সামনে কর্মচারী ঐক্যই একমাত্র অস্ত্র। আজও আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের অবদান স্মরণ করি। আমরা স্মরণ করি সেইসব সহ-যোদ্ধাদের, যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আজকের দিনে আমরা সবাই এক একজন ভাগ্যবান, এই দীর্ঘ যাত্রাপথে সমিতি নামক নৌকাটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে।

গত ২৩শে মে, ২০১৫ তারিখে সমিতির ৫০তম জন্মদিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শুরু এবং কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং ২৭শে মে, ২০১৫ তারিখে প্রাক্তন নেতৃত্ববৃন্দদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম দফার অনুষ্ঠান শেষ হয়। আজ অর্থাৎ ৯ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমিতির স্মারক পত্রিকা 'সংহতি' প্রকাশ পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাকর্মী ছাড়াও শিক্ষক, আধিকারিক, প্রাক্তন কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের গুনীজনদের রচনায় বিকশিত হলো এই সংহতি।

সমিতির Magazine Sub-committee-এর প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের ধন্যবাদ জানাই তাদের যত্ন সহকারে এই সংহতি প্রকাশ করার জন্যে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের Cultural Sub-committee-সহ কর্মচারী সমিতির প্রতিটি সদস্য/সদস্যাদের, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা না থাকলে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের এই অনুষ্ঠানগুলি করা কখনোই সম্ভব হতো না। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন।

আশা রাখি এই পত্রিকা আমাদের জীবনের চলার পথে সবাইকে উৎসাহিত করবে।

সজল গুহ
সভাপতি
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

সাধারণ সম্পাদকের কথা

সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী, সম্পাদকের কলামে লেখার দায়িত্ব আমার। দ্বিতীয়বারের জন্যও আপনারা আমাদের নির্বাচিত করেছেন এবং এই দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই লেখার শুরুতেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাকে যারা বিগত ৫০ বছর ধরে প্রতিক্ষণে সমিতিকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে আসছেন এবং এখনও সমিতিকে ভালোবেসে সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করছেন।

সমিতির বিগত নির্বাচনের সময় তৎকালীন সহঃ সাধারন সম্পাদক, বর্তমান সভাপতি শ্রী সজল গুহ মহাশয় প্রথম আমাকে সমিতির ৫০ বৎসরে পদার্পণের কথাটি বলেছিলেন। আমাদের দুজনেরই মনে হয়েছিল সমিতির ঐতিহ্যের কথা ভেবে আমাদের অবশ্যই এই সুবর্ণজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখার প্রচেষ্টা করা উচিৎ। তাই নির্বাচনের পর থেকেই সমিতির অন্যান্য কাজের সাথে সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সভা, আলোচনা ইত্যাদি আমরা চালিয়ে গেছি। কার্যকরি সভাকে বর্ধিত করে সকলকে ডেকে নিয়েও সভা করেছি - ডেকে নিয়েছি সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক, সভাপতি এবং সমিতির বয়ঃজেষ্ঠ সদস্যদের। তাঁদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি সমিতির ইতিহাস, রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পর্কে। অবাক হয়েছি দেখে যে সমিতির সূচনা পর্বে আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রপতিও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং সেই শুভেচ্ছাপত্র এখনও যত্ন সহকারে সমিতির ফাইলে রাখা আছে। সমিতির ১ নং সদস্যর ফর্ম - সেটিও যত্ন সহকারেই আছে। আমাদের মনে হয়েছে সমিতির সকল সদস্য যারা সমিতিকে ভালোবেসে সমিতির প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবে থেকেছেন, এটা তাদের অধিকার সমিতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানার, তাই সমিতির মুখপত্র 'সংহতি'-তে রাস্ট্রপতির শুভেচ্ছাপত্রটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।

সমিতির জন্ম ২৩/০৫/১৯৬৬, যারা সেদিন সভা করে ঠিক করেছিলেন যে এই সমিতি গঠন করবেন [সেই সভার কার্যবিবরণীও আমাদের সমিতির ফাইলে সযত্নেই আছে] যা রাজনৈতিক চরিত্রের উর্দ্ধে উঠে শ্রমিক, কর্মচারীর কথা ভাববে দল-মত নির্বিশেষে - অনেক দূরের বিষয় তারা দেখতে পেয়েছিলেন তাই সমিতি আজও অবলীলায় অনেক কঠিন ঝড় সামলে দিতে পারে, সমিতির ঐক্যের প্রশ্নে সকল সদস্যকে এক জায়গায় নিয়ে এসে। তাই আজও রাজনৈতিক পালা বদলেও সমিতির মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কের থেকেও বড় হয়ে দাড়ায় কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের লড়াই - দলমত নির্বিশেষে সমিতির ছাতার তলায় থেকে তা সংগঠিত হয় এবং কর্মচারী ঐক্য শক্তিশালী হয়। এ ভাবনা তো আজ ভেবে সমিতি তৈরী হয়নি - এই ভাবনা ছিল আজ থেকে ৫০ বছর আগে, তাই সেই সব নেতৃত্ব যারা সমিতিকে তৈরী করেছিলেন আমি সমিতির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা ২৭/০৫/২০১৫ তারিখে সকল নেতৃত্ব, প্রাক্তন সদস্য ও বর্তমান সদস্য - সবাইকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম - সম্বর্ধিত করতে পেরেছিলাম সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্বকে, সম্মানীত বোধ হয়েছিল তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

সমিতির ৫০ বৎসর (জন্মদিন) পালন করেছিলাম আমরা ২৩/০৫/২০১৫ তারিখেই। সেদিন ছিল শনিবার। কিছু সদস্য আমাকে বলেছিলেন শনিবারের অনুষ্ঠানটি সোমবার অর্থাৎ ২৫/০৫/২০১৫ তারিখ করতে। কার্যকরি সভায় আমরা বিষয়টি আলোচনাও করেছিলাম কিন্তু সমিতির সদস্যদের প্রতি বিশ্বাস এবং সদস্যদের সমিতির প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আমরা ঠিক করেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, ২৩/০৫/২০১৫ তারিখেই (শনিবার) আমরা সকালবেলা বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের করব। আমরা সফল হয়েছিলাম শোভাযাত্রা বের করতে, একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতাও আমরা সেদিন করেছিলাম।

আমি ২৩/০৫/২০১৫ ও ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের দুটো অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছুই শিখলাম। সমিতির প্রতি ভালোবাসা দেখলাম সদস্য এবং প্রাক্তন সদস্যদের। পাওনাগন্ডার বাইরেও যে কিছু সত্যিই থাকে তা আরও

একবার অনুভব করলাম - প্রথম সম্পাদক, শ্রী দিলীপ চৌধুরী মহাশয়কে ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় না বলে পারছিনা, কল্‌কাতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং ফিরে যাওয়ার প্লেনের ভাড়া উনি নিজেই বহন করেছেন। বর্তমান সময়ে অবাক হবার মতোই ঘটনা এটি। ছোটো ছোটো দেনা-পাওনার প্রশ্নে যখন সব সমিতিতেই সদস্যদের থাকা না থাকার আলোচনা শুরু হয় সেই সময় সমিতি থেকে আর কিছু পাওয়ার নেই জেনেও সমিতির ডাকে সুদূর কলকাতা থেকে নিজস্ব খরচে এসে সমিতির অনুষ্ঠানে যোগদান - সমিতির প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ বলে আমার মনে হয়। আমি গর্বিত, সমিতির প্রথম সম্পাদকের জন্য। আমি গর্বিত এমন একটি সমিতির সদস্য হিসেবে নিজে যোগদান করার জন্য। আমার গর্ব বোধ হয় এমন একটি সমিতির পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার জন্য।

আমরা কর্মচারী আন্দোলন করি, তাই লড়াই-আন্দোলন এসব আমাদের সমিতির জন্মগত বৈশিষ্ট। কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী বিরোধ - এ সব নিয়েই আমাদের চলাফেরা, এ সব থাকবেই। এরই সাথে সদস্যদের পরিবার ও সমিতির মধ্যেও মেলবন্ধন ঘটানোর উপাদান সমিতিকে খুঁজতে হবে যাতে সমিতিকে শক্তিশালী করা যায়। আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সদস্যদের পরিবারকেও সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে যোগদান করানোর জন্য। আমরা আর্ট কম্পিটিশন্ করেছি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি - সদস্যদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে। আমরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করেছিলাম সমস্ত সদস্যদের পরিবারের জন্য। সফলতার সাথে সবগুলোই সংগঠিত হয়েছিল। আমাদের এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে - লক্ষ্য সমিতির সাথে সদস্যদের পারিবারিক মেল বন্ধন। সমিতি শুধুমাত্র সদস্যদের পাওনা-গন্ডা মেটানোর হাতিয়ার নয় - সমিতির কাজ আরও অনেক,অনেক বড়। আমাদের সমিতিকে সেই অনেক বড় কাজের স্থানেই পৌছতে হবে।

আমরা চেষ্টা করছি কাজ করার, সাথে সাথে সমিতির অরাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখবার এবং কোনো রকম রাজনৈতিক হুমকির কাছে মাথা নত না করার, কিন্তু দেশের সমস্ত Trade Union এর গতিবিধির সাথে তাল মিলিয়েই আমাদের চলা উচিৎ বলে মনে করি কারন তা না হলে আমরা বৃহৎ কর্মচারী ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারব না। কর্মচারী আন্দোলন ব্যহত হবে।

যাঁরা প্রতিনিয়ত সমিতির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন এবং সমিতির কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করে সমিতিকে সঠিক পথে চলার পরামর্শ রেখেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজ, সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে আমাদের মুখপত্র ‘সংহতি’ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে সমিতির কর্মচারীদের আন্দোলন, লড়াই, দাবী আদায় প্রভৃতি এবং পাশাপাশি কর্মচারীবন্ধুদের প্রতিভা সঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা যেহেতু আমাদের মত প্রকাশের একান্ত নিজস্ব জায়গা তাই সদস্য / সদস্যাদের সকলকেই এই পত্রিকার বিকাশ ও একে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে ভাবতে হবে।

যাঁরা এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের ‘লেখা’ দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রম এই পত্রিকার প্রকাশনাকে বাস্তবায়িত করল তাঁদের প্রত্যেককে সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শ্রী সুমন চ্যাটার্জী

সাধারন সম্পাদক

উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

সম্পাদকীয়...

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন এরকম সকল কর্মচারী বন্ধু, ছাত্র-ছাত্রী-গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আধিকারিকসহ সকল শুভাকাঙ্খীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সমিতির মুখবন্ধ 'সংহতি' প্রকাশনা কালে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী-গবেষক-শিক্ষক-আধিকারিকদের লেখার সমন্বয়ে প্রতি বছরই সংহতি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সমিতির সাংস্কৃতিক অলঙ্কার হলো এই পত্রিকা, যার মাধ্যমে কর্মচারী বন্ধুরা তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই সকলের সযত্ন রচনায় ও সার্বিক চেষ্টায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্যবোধের আদর্শকেও সুপ্রতিষ্টিত করে। তাই কর্মচারী সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় সমিতির বার্তা ও সংকল্প ঃ 'অটুট রাখবো আমাদের কর্মসংস্কৃতি, ধরে রাখবো আমাদের ঐক্য, আন্তরিক চেষ্টা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিতে এবং অকৃপণ হবো প্রত্যেকের কর্মদক্ষতার নির্যাসটুকু দিতে'। পত্রিকা প্রকাশনায় সহযোগী সকল স্তরের গুনীজনদের জানাই ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প সঞ্চয় ঋণদান সমিতিকে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন।

পরিনত বয়সে যাঁরা চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, সেই সব কর্মীবন্ধুদের অবসর জীবন নিশ্চিন্তে এবং নিরুদ্বিগ্ন হোক এই প্রার্থনা জানাই। এছাড়া আমাদের সহকর্মী যাঁরা কর্মকাল সম্পূর্ণ না করে অকালে চলে গেছেন, তাঁদের আত্মা শান্তিলাভ করুক এই প্রার্থনা করি এবং পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-গবেষক-শিক্ষক-আধিকারিক-কর্মচারী ঐক্য দীর্ঘজীবি হোক।

পরিমলচন্দ্র রায়

এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন...

'ভালোবাসার বিয়ে' কি রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থনযোগ্য ? - ড. মহেন্দ্র নাথ রায়	১
ফিরে দেখা- ল্যাডলি রায	৫
কম্পিউটার টিপস / ট্রিক্স - মানস্ এস্	৮
The glowing legacy of the University of North Bengal continues on... -Dr. Surya Narayan Ray	১০
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পুর্তি প্রসঙ্গে দু-চারটি কথা - নিরোদ সিংহ	১৪
প্রথম সহ-সভাপতির কলমে - অশোক কান্তি ঘোষ	১৬
চা-গাছ - অজিত কুমার চক্রবর্তী	১৭
Down in the memory lane - A look back .... movement - Fazlur Rahaman	২০
কর্মচারী সংগঠন প্রসঙ্গে নতুন চিন্তা- মনতোষ ঘোষ	২৫
একটি ছোট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত - সুব্রত রায়	২৬
আকাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা - ইন্দ্রনীল রায়	২৯
সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে - রজতজয়ন্তী বর্ষ -পরিমল চন্দ্র রায়	৩২
ধরাদেবী - নরেশ চন্দ্র রায়	৩৮
গল্প হলেও সত্যি - দেবাশীষ চক্রবর্তী	৪০
বাসান্তরের পথে! - মহেশ গোপ	৪২
আতঙ্ক - প্রতাপ ভট্টাচার্য্য	৪৩
কেরানী - শম্ভু দাস	৪৪
বৃষ্টি - পার্থ বিশ্বাস	৪৫

‘ভালোবাসার বিয়ে’ কি রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থনযোগ্য ?

Is “Love-Marriage” Acceptable in View of Chemistry?

ড. মহেন্দ্র নাথ রায়

অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান এক উজ্জ্বল আলোক শিখা। বিজ্ঞানের জগৎ যেন এক স্বপ্নের জগৎ। বিজ্ঞান যেন এক অন্বেষণ। এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করাই হল বিজ্ঞান। আর এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে প্রকৃতির নিয়মগুলি। বিজ্ঞান অবশ্য প্রকৃতির নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে পারে না। তবে প্রকৃতির নিয়মগুলি কীভাবে ব্যবহার করলে তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে সেই পথ বলে দিতে পারে। বিজ্ঞানই একমাত্র জিনিস যা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত রকমের দূষণ ও কলুষ থেকে মুক্ত, কারণ বিজ্ঞানের মধ্যে কোন রকম ভণ্ডামি, বজ্জাতি, দম্ভ ও কদর্য রুচির স্থান নেই।

আমি এখানে বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল আলোকশিখার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি যা বর্তমান সমাজে মানব জীবনের এক জ্বলন্ত সমস্যার (পণপ্রথা) সহজ ও সরল সমাধান দিতে পারে।

রসায়ন শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি বিক্রিয়কের সঙ্গে অপর কোন পদার্থ সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করা হয় তবে ঐ পদার্থটি কেবলমাত্র উপস্থিত থেকে ঐ বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে, কিন্তু বিক্রিয়া শেষে ঐ পদাথটির কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। মিশ্রিত ঐ পদার্থটিকে বলা হল অনুঘটক (Catalyst)। অনুঘটকের উপস্থিতিতে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রভাবিত হওয়াকে বলা হয় অনুঘটন (Catalysis)।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করার সময় পটাসিয়াম ক্লোরেটের ($KClO_3$) সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) মেশানো বিক্রিয়ার গতিবেগ ত্বরান্বিত হয় এবং কম তাপমাত্রায় অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়, কিন্তু বিক্রিয়া শেষে MnO_2 অপরিবর্তিত থাকে। MnO_2 না মেশালে অধিক তাপমাত্রায় প্রয়োজন হতো।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ

$$2KClO_3 + MnO_2 = 2KCl + 3O_2 + MnO_2$$

অনুঘটক (Catalyst)

অনেকক্ষেত্রে অ্যাসিড অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে (সুক্রোজ) ($C_{12}H_{22}O_{11}$) আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে রূপান্তরিত হয় এবং অ্যাসিড অপরিবর্তিত থাকে।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O + H_2SO_4 = C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 + H_2SO_4$$

অনুঘটক (Catalyst)

কতকগুলি অনুঘটন রয়েছে যেখানে বাইরে থেকে কোন অনুঘটকের আমদানি করতে হয় না, বিক্রিয়া মধ্যস্থ পদার্থই অনুঘটক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের অনুঘটনকে বলা হয় স্বয়ং অনুঘটন (Auto-Catalysis) এবং ব্যবহৃত পদার্থটিকে বলা হয় স্বয়ং অনুঘটক (Auto-Catalyst)।

উদাহরণ স্বরূপ ইথাইল অ্যাসিটেটকে ($CH_3COOC_2H_5$) আর্দ্রবিশ্লেষিত করতে বাইরে থেকে কোন অনুঘটকের প্রয়োজন হয় না, বিক্রিয়া মধ্যস্থ পদার্থই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ

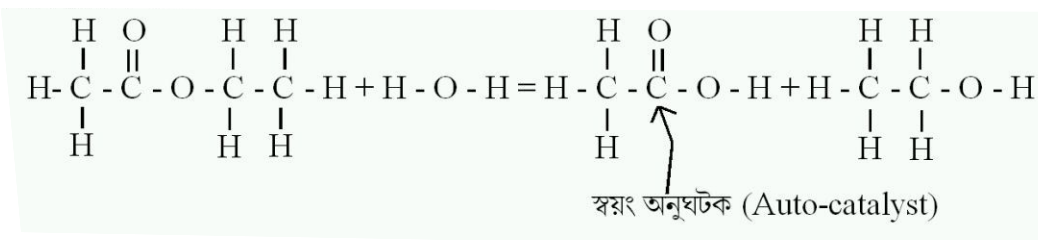

ভালোবাসার বিয়ে (Love-marriage) **প্রসঙ্গেঃ**

আমরা সকলেই জানি, সাধারণ বিয়েতে (Social-marriage) ছেলে ও মেয়ের পারস্পারিক যোগসূত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় না, একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় যাকে বলা হয় ঘটক (Match-maker)। ঘটক বৈবাহিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের গতিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে সে অপরিবর্তিত থাকে। যেমন

ছেলে + মেয়ে + ঘটক = দম্পতি + ঘটক

ঘটক (Match-maker)

পক্ষান্তরে, ভালোবাসার বিয়েতে (Love-marriage) মধ্যস্থ কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। দু'জনের মধ্যে পারস্পারিক বোঝা -পরার উপর ভিত্তি করেই এই ধরণের বিয়ে হয় এবং তারা নিজেরাই ঘটকের ভূমিকা পালন করে।

যেমন

ছেলে + মেয়ে = দম্পতি

স্বয়ংঘটক

(Auto-match-maker)

আলোচ্য বিষয় থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বয়ং অনুঘটনের সঙ্গে ভালোবাসার বিয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং সেগুলি নিম্নরূপ

সাদৃশ্য

স্বয়ং অনুঘটন (Auto-catalysis)	**ভালোবাসার বিয়ে** (Love-marriage)
■ বাইরে থেকে কোন অনুঘটকের প্রয়োজন হয় না। ফলে আর্থিক সাশ্রয়। ■ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উপযুক্ত বিকারক উপযুক্ত বিকারকের সংস্পর্শে এলেই সম্ভব। ■ তুলনামূলক ভাবে দ্রুত।	■ বাইরে থেকে কোন ঘটকের দরকার হয় না। যার ফল স্বরূপ আর্থিক সাশ্রয়। ■ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। দু'জন পরস্পরকে উপযুক্ত বলে মনে করলেই সম্ভব। ■ তুলনামূলক ভাবে দ্রুত।

বৈসাদৃশ্য

স্বয়ং অনুঘটন (Auto-catalysis)	**ভালোবাসার বিয়ে** (Love-marriage)
■ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা অপরিবর্তনশীল। ■ বাধার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। ■ কোনরকম সমালোচনা এবং দোষারোপের প্রশ্ন আসতে পারে না।	■ একটি সামাজিক নিয়ম যা পরিবর্তনশীল ■ বাধা বা আপত্তি আসতে পারে যা ক্ষণস্থায়ী। ■ কোনরকম সমালোচনা এবং দোষারোপের প্রশ্ন আসতে পারে যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

স্বয়ং অনুঘটনের (Auto-catalysis) সঙ্গে ভালোবাসার বিয়ের (Love-marriage) বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভালোবাসার বিয়ে উপযুক্ত সময়ে এবং প্রতিষ্ঠিত জীবনে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত। তবে মনে রাখা দরকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঠিক ব্যবহার যেমন মানুষের অশেষ কল্যাণ করতে পারে, অপব্যবহারও তেমনি ডেকে আনতে

পারে মানুষের চরম সর্বনাশ। যেমন আগুন জ্বালিয়ে পড়াশোনাও করা যায় আবার বধূ হত্যার মত বর্বরতাও করা যায়। তাই কেউ যদি ভালোবাসার বিয়ের অজুহাতে ভণ্ডামি ও বজ্জাতি করতে চায়, তবে তা বিজ্ঞানের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ফিরে দেখা

ল্যাডলি রায়

কাগজ, বইপত্র, পত্রপত্রিকা লেখাপড়ায় আত্মমগ্ন এক শীতের শেষ সকালে ফোন বেজেছিল। সাড়া দিতে শুনতে পেলাম, 'আমি সজল, ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি' - কথা শুনতে শুনতেই, অন্যমনস্ক-মগ্নতা থেকে মগ্নতাহীন মনস্কতায় ফেরার কয়েক লহমায় ভাবতে পারলাম, ফিজিক্সের সজল সরকার এখন ফোন করছে কেন? সজলবাবুর ছোটখাটো নিখুঁত দাড়ি- গোঁফ কামানো, ফিটফাট পোষাকের চেহারাও মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। সেই কয়েক মুহূর্তের অনিশ্চয়তায় ফোনের সজল বুঝে যায় আমি চিনতে পারি নি। খুব দ্রুত আত্মপরিচয় দিতে শুরু করে 'আমি সজল গুহ'। তখন অনিশ্চয়তা আর থাকে না। সজলই জানালো আমাদের কর্মচারী সমিতির পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে - সেই কারণে উৎসব, ইত্যাদি। সজল এখন কর্মচারী সমিতির সভাপতি। সেই সূত্রেই এই লেখা।

ইউনিভার্সিটি আর সজল শুনেই আমার তাৎক্ষণিক চিন্তায়, চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছরের পুরনো অনুসঙ্গ মনে এলো এ কারণেই যে চাকরি বাকরির নানা অদলবদলের পরেও কর্মচারী সমিতি আমার মনে স্থায়ী হয়ে আছে এখনও,এই অবসর জীবনেও, এই পঁচাত্তর ছোঁয়া বয়সেও?

পঞ্চাশ বছর আগে, মে মাসের এক বিকেলে শালবনে, আমরা কর্মচারী সমিতির গোড়া পত্তন করেছিলাম তো সমবেত হওয়ার চাপ প্রয়োজন ও তাগিদ থেকে। তাগিদ তো একদিনে জমা হয় না। প্রতিদিন একটু একটু করে চাপ তৈরি হয়। নিরাপত্তার অভাব ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমিত হতে থাকে। একা একা সেই ভার বহন যখন অসহনীয় হয়ে উঠে তখনই মনে হয় আরো সবার সঙ্গে যদি ভাগ করে নেওয়া যেত, ভার-বহন বোধ হয় সহনীয় হতে পারতো। তখন আমাদের সত্যিই খুব খারাপ অবস্থা। পঞ্চাশ-সত্তর-আশি টাকা বেতনে বছরের পর বছর চাকরি করার পরও কারো মাইনে বাড়ে না। কোনো বেতনক্রম নেই। ডি.এ. নেই, বাড়ি ভাড়া নেই, এমনকি দু-একজন ভাগ্যবান ছাড়া কারো অ্যাপোয়েন্ট লেটারও নেই। একজন যে চাকরি করছে, মাইনে পাচ্ছে, কোন অধিকারে তার কোনো আইনি প্রমাণ নেই। এসব মিলিয়ে এক সার্বিক অনিশ্চয়তা সবার গলায় যেন ফাঁস হয়ে জড়িয়ে ছিলো। এর কারণ অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বচ্চোও তখন একমাত্র ব্যক্তির, উপাচার্য-র, প্রশাসন চালানোর দৃষ্টিভঙ্গী। তখনও কোর্ট-ইসি এসব তৈরিই হতে পারেনি বা যথাযোগ্য দায়িত্বপালন করতে শুরু করে নি। এর মধ্যেই প্রথম উপাচার্যর কার্যকাল শেষ হওয়ার সময় এসে গেল। তিনি আরো চার বছর থাকবেন না নতুন কেউ আসবেন এ নিয়ে সংশয় তৈরি হলো আমাদের, কর্মচারীদের, অনিশ্চয়তাও অসহনীয় হয়ে ওঠে। এখন আর মনে নেই কোনো বিজ্ঞপ্তি বা লিখিত আবেদন করা হয়েছিলো নাকি মুখে মুখেই সবাইকে শালবনে আসতে বলা হয়েছিলো। তবে এই সমাবেশের প্রধান উদ্যোগ ছিলো দিলীপ চৌধুরী ও আমার। সবাই এসেছিলেন। সেদিনই সমিতি তৈরি হলো। সেদিন থেকেই একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।

আমি কোনো ইতিহাস-ভূগোল শোনাবো না। সে যাদের জানার জেনে নেবে। আমি কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলবো না। বলার কোনো অর্থ নেই তা-ই বলবো না। একটা বিশেষ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা তো সেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় অর্জিত, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। এই নানা অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। এই জ্ঞানের বিনিময় হতেই পারে। জ্ঞানের বিনিময় সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান সমবায়ের জ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আমাদের কর্মচারী সমিতি জন্মক্ষণ থেকেই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ নামতে বাধ্য হয়েছিলো পরিস্থিতির চাপে। আমরা নিজেদের প্রস্তুত করার সময়ও পাই নি। আমাদের দাবি-দাওয়াও ঠিকঠাক সাজিয়ে উঠতে পারিনি। সমিতির নেতাদের পারস্পরিক বোঝাপড়াও তখনও তেমন করে হয়ে ওঠেনি। আমাদের লড়াই-এর ময়দানে নেমে পড়তে হয়েছে।

এতসব অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমরা যে কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলাম তার একমাত্র কারণ, আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমাদের, সর্বস্তরের কর্মচারীরা বিশ্বাস করেছিলেন, আমাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। এ-তো নির্ভরতার একটা চাপ তো থাকে। সেই চাপ কাটিয়ে দিয়েছিলো সংগঠন। নেতৃত্বের যে কোনো কথা কোনো প্রশ্ন না করে মুখ বুজে পালন করেছেন সবাই। নেতাদের ভালো না বাসলে এ-তো বিশ্বাস বোধহয় করা যায় না। এই আস্থা, নির্ভরতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, যতদিন চাকরি করেছি, পেয়েছি। আমি সত্যি করেই সবার কাছে কৃতজ্ঞ। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়-তো প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পেয়েছি। আজকে, আমার কর্মচারী সমিতির পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে আমি যে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পেলাম, সমিতির বর্তমান নেতৃত্বকে তার জন্য ধন্যবাদ।

কর্মচারী সমিতির উপর কর্তৃপক্ষের আক্রমণ কিন্তু প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিলো। প্রথম উপাচার্যকে দ্বিতীয়বারের মনোনয়ন না দিয়ে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়কে উপাচার্য করে পাঠানো হয়। তিনি জলপাইগুড়ির চা-বাগানের মালিক পরিবারের মানুষ। বিলেত ফেরত। তিনি শুরু থেকেই চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলন দমনের কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির উপর আক্রমণ করলেন। এক সিকিউরিটি ফোর্স তৈরি হলো উত্তরবঙ্গের এখান-ওখান থেকে এমন কিছু লোকজন এনে, যাদের অনেকের বাহুবলের দুর্ণাম ছিল। এই সব লোকজন সরাসরি ভয় দেখিয়ে, কর্মচারীদের মধ্যে সন্ত্রাস তৈরি করলো। উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদতে, উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায়, এক নতুন কর্মচারী ইউনিয়ন তৈরি হলো রাতারাতি। আমাদের সমিতির অনেকে ভয়ে, আতঙ্কে সেই ইউনিয়নে যোগ দিলেন, অনেকে যোগ হয়তো দিলেন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দূরত্বও তৈরি করলেন না। এখন যেখানে ইউনিভার্সিটি এভিনিউ -এর পুজো হয়, সেখানে একটা ঘরে আমাদের সমিতির অফিস ঘর ছিলো। সেই অফিস ঘর থেকে আমরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে গেলে, এক নম্বর গেট বন্ধ করে, সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন আমাদের ভেতরে ঢোকা আটকে দেয়। কোনোরকম বাদানুবাদে না জড়িয়ে, এক নম্বর গেটের সামনে আমরা সভা করলাম। সেই মিছিলে আমরা বাহাত্তর জন ছিলাম।

সে বড় সুখের সময় না। আমরা জানতাম যাঁরা আমাদের ছেড়ে গেছেন তাঁরা নিজের ইচ্ছায় যান নি। যেতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথম সুযোগেই ফিরে আসবেন। কিন্তু সেই সুযোগ তৈরি করতে হবে আমাদের। কোনো রকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে আমরা দাঁতে দাঁত চেপে বাহাত্তর জন লড়াকু কর্মচারী এক অসম লড়াই চালিয়ে গেলাম। যে কোনো শ্রমিক-কর্মচারী সমিতির কাছে এই লড়াই আত্মশুদ্ধির লড়াই, আত্মরক্ষার লড়াই শক্তিসংহত করার লড়াই, অপেক্ষার লড়াই। বাহাত্তর জন কর্মচারী নিজেদের শরীর প্রাণ বাজি রেখে লড়াই-এ সামিল হয়েছিলাম। আমরা জানতাম আমরা জিতবই। আমরা তো কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে ও মদতে, তাদের পক্ষে ও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্দোলন করিনি, আন্দোলন করেছি কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য। দাঁতে দাঁত চেপে আন্দোলনের কয়েকমাস ছিলো আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। আমরা জিতেছিলাম।

এই লড়াই আমাদের শিখিয়েছিল, আক্রমণের সামনে কর্মচারী ঐক্যই একমাত্র অস্ত্র। বাহাত্তর জন কর্মচারীর দৃঢ়তা আর প্রতিরোধে ক্ষমতা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। উপাচার্যের তৈরি করা ইউনিয়ন খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। সিকিউরিটি ফোর্সের বাহুবলীরা পালিয়ে গেছে। যাঁরা ঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসেছেন। কর্মচারী সমিতি নিজের চলন ফিরে পেয়েছে। নতুন চলার ছন্দে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে সামনে এগিয়েছে। এর পরেও কি সমস্যা দেখা দেয় নি? দিয়েছে। সে সমস্যা কখনো বাইরের, কখনও-বা সমিতির ভিতরেই। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয়নি। আন্দোলনহীন, আপাত সুখের সময় যখন-তখন যে সমিতির চলন-বলনে ঔচিত্যের অভাব ঘটে নি। শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনই যখন ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে যায়, তখন পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে ফিরে আসাও একটা লড়াই।

পঞ্চাশ বছর যে কোনো সংগঠনের পক্ষেই খুব বড় ব্যাপার। আমাদের সমিতি সেই খুব বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারলো সবার এক পতাকার নিচে থাকার ইচ্ছেতেই। আমরা যে চলা শুরু করেছিলাম, সেই চলাটা কখনও থেমে যেতে দেননি পরের প্রজন্ম। আমি এই পঁচাত্তর ছোঁয়া বয়সে আমার পঞ্চাশ বছরের কর্মচারী সমিতিকে আরো একবার সেলাম জানাতে পারি মাত্র। কর্মচারী সমিতি দীর্ঘজীবী হোক।

কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

মানস্ এস্
তথ্য বিজ্ঞানী
গ্রন্থাগার বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
জেলা দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০১৩
ই-মেল : manash.esh@gmail.com

1. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

১> GO " RUN " – tree লিখে এন্টার করুন।
২> GO " RUN " – prefetch লিখে এন্টার করুন। (একটা নতুন উইন্ডো আসবে সব ফোল্ডার এবং ফাইল ডিলিট করুন।
৩> GO " RUN " – temp লিখে এন্টার করুন। এখন টেম্পোরারী ফাইল গুলো ডিলিট করুন।
৪> GO " RUN " – %temp% লিখে এন্টার করুন। এখন টেম্পোরারী ফাইল গুলো ডিলিট করুন।

প্রতিটা ড্রাইভের উপর মাউসের রাইট বাটুন ক্লিক করুন তারপুর প্রপারট্রিজ এ ক্লিক করুন ডিস্ক ক্লিনআপ এ ক্লিক করুন। আশা করি আপনার কম্পিটার এ অনেক গতি বেড়ে যাবে। পুরাতন কম্পিউটার এর জন্য বেশী কার্যকরী।

2. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স (Computer কেন এবং কিভাবে Hang হয়?)

→ কম্পিউটারের প্রসেসরের মান বা কাজের তুলনায় স্পীড কম হলে।
→ কম্পিউটার র‍্যামের তুলনায় বেশী পরিমাণ কাজ করলে।আপনার কম্পিউটার র‍্যাম এর পরিমাণ কম কিন্তু আপনি অনেক বড় বড় কয়েকটি প্রোগ্রাম চালু করলেন। তাহলে তো হবেই।
→ কম্পিউটার হার্ডডিক্স এর কানেকশন এবং প্রসেসরের কানেকশন ঠিকমত না হলে, বার বার একই সমস্যা হতে পারে
→ যদি বার বার হ্যাং হয় তাহলে Cooling Fan টা check করেন এটা স্পীডে গুরছে কিনা।
→ hard diskএ Bad sector থাকলে বা অন্য কোন হার্ডওয়্যারে ত্রুটি থাকলে।
→ অপারেটিং সিস্টেমে ত্রুটি থাকলে মানে...কোনো সিস্টেম ফাইল file delete হয়ে যাওয়াকে বুঝায়। যার কারণে কম্পিউটারে সমস্যা হতে পারে।
→ কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণত Hang হতে পারে।
এই কারণেই কম্পিউটারে বেশী Hangহয়। আর এই ভাইরাস অপারেটিং সিস্টেমের কিছু ফাইলের কার্যপদ্ধতিকে বন্ধ করে দেয় যার কারণে কম্পিউটার প্রয়ই হ্যাং হয়। কম্পিউটারে অতি উচ্চ মানের এন্টি ভাইরাস ব্যবহার করুন।
→ হাই গ্রাফিক্স সম্পন্ন গেইম চালালে তখন র‍্যাম সম্পূর্ণ লোড হয়ে যায় এবং hang হওয়ার সম্ভনা থকে।

3. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

কিছু সময় পরপর Start থেকে Run-এ ক্লিক করে tree লিখে ok করুন। এতে RAM কার্যক্ষমতা বাড়ে।

4. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

Ctrl + Alt + Delete চেপে বা টাস্কবারে মাউস রেখে ডান বাটনে ক্লিক করে Task Manager খুলুন।তারপর Processes-এ ক্লিক করুন। অনেকগুলো প্রোগ্রাম-এর তালিকা দেখতে পাবেন। এর মধ্যে বর্তমানে যে প্রোগ্রামগুলো কাজে লাগছে না সেগুলো নির্বাচন করে End Process-এ ক্লিক করে বন্ধ করে দেন। যদি ভুল করে কোনো প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেন এবং এতে যদি অপারেটিং সিস্টেম এর কোন সমস্যা হয় তাহলে কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন।

5. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

প্রতি সপ্তাহ একবার আপনার hard drive Defragment এবং disk cleanup করুন। (1. click start – all programs – accessori – system utility – Defragment drive utility
2. click start – all programs – accessori – disk cleanup)

6. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

পিসি সেফ মোডে চালু হলে কি করবেন?

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে চালু হতে না পারলে অনেক সময় সেফ মোডে চালু হয়। সেফ মোড হলো উইন্ডোজের বিশেষ একটি অবস্থা যখন এটি একেবারে প্রয়োজনীয় ফাইল এবং ড্রাইভারসমূহ নিয়ে লোড হয়। বলা যেতে পারে 'বিপদকালীন' অবস্থা যখন ন্যূনতম রসদ দিয়ে প্রাণে বেচে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেফ মোডে উইন্ডোজ চালু হলে প্রাথমিক ভাবে রিস্টার্ট করে দেখা যেতে পারে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে তা চালু হয় কিনা। বার বার করে ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে সমস্যাটি গুরুতর। উইন্ডোজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের ক্ষতি বা হার্ডওয়্যারের সমস্যার কারণে তা হতে পারে। কোনো নতুন হার্ডওয়্যার সেটিংস পরিবর্তনের ফলে যদি উইন্ডোজ বার বার সেফ মোডে চলে যায় তবে পূর্ববর্তী সেটিংসটি রিভার্স করে ফেলাই শ্রেয়। সেফ মোডকে এজন্য ডায়াগনিস্টিক মোডও বলা হয়। উইন্ডোজ চালু হওয়ার সময় F8 চাপলে যে মেনু আসে সেখান থেকে সেফ মোড চালু করা যেতে পরে। তবে আগেই বলা হয়েছে; এটি ডায়াগনিস্টিক মোড। এই মোডে বাড়তি কোনো কিছুই যেমন- সাউন্ড, প্রি ার, হাই কালার ডিসপ্লে ইত্যাদি কিছুই কাজ করবে না।.

7. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

যে কোন application close করার পর আপনার desktop F5 চেপে refresh করে নিন, যা আপনার পিসির RAM হতে unused files remove করবে।

8. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

.ডেস্কটপ wallpaper হিসেবে very large file size image ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
ডেস্কটপে অতিরিক্ত shortcuts রাখবেননা। আপনি জানেন কি ডেস্কটপে ব্যবহৃত প্রতিটি shortcut up to 500 bytes of RAM ব্যবহার করে।

9. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

প্রতিদিন আপনার ডেস্কটপের recycle bin Empty করে রাখুন। (The files are not really deleted from your hard drive until you empty the recycle bin.)

10. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

অনেক সময় PC'র RAM কম থাকলে PC slow হয়ে যায়। ভার্চুয়াল মেমোরি বাড়িয়ে কিছুতা গতি বাড়ানো যায়। এর জন্য- My Computer এ মাউস রেখে right button ক্লিক করে properties-e যান। এখন advance এ ক্লিক করে performance এর settings এ ক্লিক করুন। আবার advance -এ ক্লিক করুন। এখন change এ ক্লিক করে নতুন উইন্ডো এলে সেটির Initial size ও Maximum size-এ আপনার ইচ্ছামত size লিখে set-এ ক্লিক করে ok দিয়ে বেরিয়ে আসুন। তবে Initial size এ আপনার PC'র   RAM দ্বিগুণ এবং Maximum size এ RAM চারগুন দিলে ভাল হয়।

11. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

কম্পিউটার ভাল রাখার কিছু টিপ্স জেনে নিন
↓
১. প্রতি ১ বা ২ মাস পর পর কম্পিউটার খুলে সব parts মুছে নতুন করে লাগিয়ে দিন।
২. Ram খুলে পাতলা তুলো দ্বারা মুছে নতুন করে লাগিয়ে নিন।
৩. কম্পিউটারের উপর কোন ভারী কিছু রাখবেন না।
৪. রাতে ঘুমাবার সময় কম্পিউটার shut down করে দিন।
৫. বিদ্যুৎ চলে গেলে যেন কম্পিউটার বন্ধ না হয়ে যায় সে জন্য UPS ব্যবহার করা উচিৎ।
৬. কম্পিউটার VIRUS দূর করার জন্য অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা উচিৎ।
৭. কম্পিউটারকে আলো-বাতাসপূর্ণ জায়গায় রাখুন।
৮. প্রতিদিন মনিটর, বিশেষ করে LCD মনিটর একবার করে মুছে রাখবেন।
৯. অনেকে কম্পিউটার চলার সময়ও CPU-র উপর আলাদা পর্দা দিয়ে রাখেন, যাতে ময়লা প্রবেশ না করে। এতে আরও ক্ষতিই হয়।
১০. ওয়ালপেপার হিসেবে এমন ছবি সেট করুন, যা আপনার চোখকে আরাম দেয়। ওয়ালপেপার সাইজে যত ছোট হবে, আপনার কম্পিউটারের গতির জন্য ততই ভাল।
১১. নিয়মিত 'কুলিং ফ্যান' মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

12. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

"Press any key to canceled এর সমাধান….."
> স্টার্ট থেকে রানে লিখুন সিএমডি (cmd) এবার এন্টার চাপুন।
>এরপর লিখুন সিএইচকেএনটিএফএস-স্পেস-ড্রাইভ লেটার (E:) স্পেস ব্যাকস্লাস(/)এক্স অর্থাতঃ (chkntfs E: /X) লিখে এন্টার দিন ব্যাস এবার কম্পিউটার রিস্টার্ট দিন।

13. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

অনেক সময় START MENU SHOW করতে দেরি হয় বা LOCAL   DISK এর যে কোন পেজ ওপেন করতে দেরি হয় যা খুব বিরক্তিকর। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিচের পথ অনুসরন করুন। প্রথমে START MENU থেকে RUN এ ক্লিক করুন। তাতে REGEDIT.EXE লিখে OK করুন। REGISTRY EDITOR BOX আসবে, সেখান থেকে HKEY_CURRENT_USER ট্যাবে ক্লিক করুন তারপর সেখান থেকে CONTROL PANEL হয়ে DESKTOP ক্লিক করুন। DESKTOP এ ক্লিক করার পর ডান পাশের BINARY DATA হতে MENUSHOWDELAY তে ডাবল ক্লিক করুন। যে EDIT STRING BOX আসবে তা হতে VALUE DATA "0" করে OK করুন। তারপর কম্পিউটার RESTART করুন। দেখবেন আপনার কম্পিউটার আগের তুলোনায় দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়েছে এবং LOCAL DISK পেজ OPEN হতে সময় কম নিচ্ছে।

14. কম্পিউটার টিপস /ট্রিক্স

কি বোর্ডের সাহায্যে চালু করুন কম্পিউটার
আমরা সাধারণত CPU-এর পাওয়ার বাটন চেপে কম্পিউটার চালু করি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, পাওয়ার বাটনে কোনো সমস্যা থাকলে কম্পিউটার চালু করতে অনেক কষ্ট হয়। আমরা ইচ্ছা করলে CPU-এর পাওয়ার বাটন না চেপে কি-বোর্ডের সাহায্যে খুব সহজেই কম্পিউটার চালু করতে পারি। এর জন্য প্রথমে কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কি-বোর্ড থেকে Del বাটন চেপে Bios-এ প্রবেশ করুন। তারপর Power Management Setup নির্বাচন করে Enter চাপুন। এখন Power on my keyboard নির্বাচন করে Enter দিন। Password নির্বাচন করে Enter দিন। Enter Password-এ কোনো একটি কি পাসওয়ার্ড হিসেবে দিয়ে সেভ (F10) করে বেরিয়ে আসুন। এখন কি-বোর্ড থেকে সেই পাসওয়ার্ড কি চেপে কম্পিউটার চালু করতে পারেন।

The glowing legacy of the University of North Bengal continues on...

- Dr. Surya Narayan Ray,
Assistant Professor of Commerce

1. **The formation**

> '*During the critical situation, starting of the university teaching is not possible, so I declare officially the Happy opening of North Bengal University today (1.11.1962) in your presence and further I declared it is closed sine die...*'
> *- Late Binayendranath Dasgupta,*
> ***The first Vice Chancellor,***
> ***The University of North Bengal***[1]

The birth of the University of North Bengal was baptism by fire, as the emergence of the University, commonly referred to by its acronym as NBU, and was steeped with difficulties and challenges of the Indo-China War and its tragic aftermath. So, much so that The NBU had to be hastily closed sine die, as due to the Chinese invasion, the University which nestles in the foothills of the majestic Himalayas had to temporarily give its Rammohunpur campus for the crucial lodging of the Indian Army, on the urgent request of the then Air Marshal Mr. Chakraborty, a close friend of the first Vice Chancellor of the NBU. Interestingly, the Late Binayendranath Chakraborty, born at Jalpaiguri but who had worked at Lucknow University for a few decades, had named the NBU University campus as Rammohunpur after the great Indian reformer, Raja Rammohun Roy. In a land mark speech in the hallowed precincts of the West Bengal Legislative Assembly in the month of November of 1961, the then Chief Minister of West Bengal, the late Doctor Bidhan Chandra Roy had envisioned the important role of the NBU in the socio-politico-economic development of North Bengal, a land of pristine beauty. [2] Indeed, the development of North Bengal is not only of immense strategic importance from the national perspective, but the untarnished beauty of North Bengal is reminiscent of heaven on earth, so much so, that even Shah Jahan, the architect of the immortal Taj Mahal, would have been glad to expand his euphemism of Taj Mahal to North Bengal by describing the land of North Bengal as heaven on earth 'If there is heaven in earth, it is here, it is here, it is here...'. Thus, the NBU came into existence with the enactment of the West Bengal Legislative Act (XXVIII of 1961) with the assent of the President of India on 15th of December, 1961. The Act became operative from the 15th of May, 1962. [3]

> '*The entire area of North Bengal comprising the districts of Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar, Malda and West Dinajpur were vulnerable from the political point of view. It was strongly felt that this area should at once be developed socially, economically and from educational points of view without any loss of time.*' (22nd November, 1961, West Bengal Assembly)
> - *Late Bidhan Chandra Roy,*
> *The former Chief Minister of West Bengal.*[4]

2. **The initial turmoil**

The campus of the NBU was infested with '*jungles, snakes, bushes and animals*' in the words of the first Vice Chancellor of NBU. [5] in the aftermath of the Indo-Chinese war and especially after the passing away of the Doctor Bidhan Chandra Roy, the development of NBU hit some road blocks. The pace of development was slow. The engineers of Sibpur Engineering College took on the onus of building the infrastructure of the NBU and by November, there was in place 13 low cost houses and 20 building apartments. So, the classes of NBU could start by November, 1962 with the advent of 9 teachers. But, due to the disturbance caused by the turmoil of the Chinese invasion, the boys hostel of the Siliguri College served as the venue of the classes of the NBU with 45 students studying in 6 departments, namely English, Economics, Political Science, Physics, Mathematics and Geography from 5th November, 1961 onwards. The then Principal of Siliguri College, Dr. Durga Kinkor Chattopadhyay had played a key role in extending a helping hand to the NBU to conduct its classes in the difficult times. The teachers were given accommodation at the Kulada Bhavan. As much as 8000 students pursued their undergraduate courses under 16 colleges of the NBU. Afterwards, 2 more departments, namely Zoology and Botany were added on in the Darjeeling Government College. The names of the founding teachers and employees of the NBU are given below in Table 1 and Table 2, respectively.

Table 1

Sl.No.	Names of teachers	Subjects	Date of joining
1	Dr. Satyaprasad Sengupta	English	1/11/1962
2	Dr. Sudhanghshu Bhattacharya	English	1/11/1962
3	Dr. Santiranjan Dasgupota	Mathematics	1/11/1962
4	Dr. Mahadeb Datta	Mathematics	1/11/1962
5	Dr. Sujanbandhab Chattopadhyay	Geography	1/11/1962
6	Sri Mrinalkanti Datta	Geography	1/11/1962
7	Sri Anindya Paul	-	1/11/1962
8	Sri Bimal Kumar Bajpayee	Political Science	1/11/1962
9	Sri Tarun Mukhopadhyay	-	1/11/1962

Source: Anindya Paul, 2011, Reflections

Table 2

Sl. No.	Names of employees	Date of joining
1	Sri Amarnath Mukherjee	16/7/1962
2	Sri Ajit Kumar Ghosh	16/7/1962
3	Sri P. N. BNanerjee	18/7/1962
4	Sri Haripada Dey	20/7/1962
5	Sri Muklul Majumdar	24/7/1962
6	Sri Ranabir Das	2/8//1962
7	Sri Debabrata Basu	13/8//1962
8	Sri Prasanta Sen	18/8//1962
9	Sri Manoj Chakraborty	20/8//1962
10	Sri Amitabha Choudhury	3/9//1962
11	Sri Gobinda Bandhu ASdhikary	12/10//1962
12	Sri Santi Kumar Mandol	15/10//1962
13	Sri Apurba Kumar Chatterjee	18/10//1962
14	Sri Nripendra Kumar Sengupta	22/10//1962
15	Sri Ramapati Ghosh	1/11//1962
16	Srimati Rekha Mishra	1/11//1962
17	Sri Kartik Chandra Ray Sarkar	1/11//1962

On that eventful day of 1st of November, 1962 only 7 out of the above-mentioned 9 teachers were able to be physically present (Sl. No. 1 to 7). The important stakeholders of NBU along with the teachers are the employees and students. The names of the 17 employees with whose help NBU began its arduous task of spreading the light of higher education in North Bengal are given in Table 2.

3.**The expansion**

In 1963, the NBU returned to its present campus after the Chinese aggression had ended. General Choudhuri of the Indian Army had played an instrumental role in its return to the present campus, slowly, life returned to normalcy. The Indian administrative department had also played an important role in its returning the NBU to normalcy. Interestingly, it was the noted Professor V. K. R. V. Rao who gave the first convocation address at NBU. With the passage of time, the baton of Vice Chancellorship changed hands. In 1966, Professor A. C. Roy was appointed as the new Vice Chancellor of NBU. New departments like Philosophy, History and Bengali opened at the University. The new Vice Chancellor took the initiative to start the department of agriculture to make NBU self sufficient in food. The Medical College was started in 1968 by Professor A. C. Roy and initially 35 students were admitted. In 1972, the Medical College shifted to its present day location at Kawakhali in Susrut Nagar.

The period of 1966-1970 coincided with the political and natural disasters and presented a challenge to the functioning of the MNBU. Due to some of the students indulging in political movements, the NBU was actually closed for nearly seven months. Also, due to floods and landslides in 1968, the NBU faced stiff challenges as communication in some areas like Jalpaiguri was restricted. But, the teachers, employees and the students of the University responded to these challenges with great

courage. They donated generously to the flood-affected victims. The students of NBU displayed exemplary character when they resisted the urge to cheat during the examinations and NBU became the shining example of smooth conduct of examinations to the rest of West Bengal.

In 1970, the baton of Vice-Chancellorship of NBU again changed hands and Professor P. C. Mukherjee became the new Voce-Chancellor of NBU. Slowly, NBU became a centre of quality higher education and output in research work increased. NBU has been accredited with a B++ level by the National Assessment and Accredited Council (NAAC) and NBU is recognised as a Pioneer Centre of Higher Education in India today with international students and researchers flocking to the University campus every year in huge droves.

4. **The current scenario**

NBU offers an array of services, namely Postgraduate and Under Graduate teaching, research, consultancy, extension, no-formal education, Refresher, Orientation and Workshops to the teachers, employees and students. NBU has reached out to the wider bases of the society itself, and day by day, the number of stakeholders of NBU are increasing. It now boasts of 10 post graduate departments in Science. It has 5 important Centres under the Faculty of Science, besides the Centre for Development Studies: Research and University Consultancy Cell. Other notable Post Graduate Diploma under the Faculty of Science are the Post Graduate Diploma in Tea Management and self-financed courses. NBU has15 departments and 7 centres under the Faculty of Arts and Commerce. Some notable centres are the Centre for Himalayan Studies, Centre for Women's Studies, Centre for Studies in Local Languages and Culture, Centre for Ambedkar Studies, Centre for Buddhist Studies, Centre for Nehru Studies and Centre for Gandhi Studies. NBU has Directorate of Distance Education in Arts as well as in Science. NBU has a very well equipped Library and Archive. The Akshay Kumar Maitreya Heritage Museum is internationally acclaimed. The Sports Board, the Alumni Association, the Academic Staff College and other units are functioning commendably. As one wanders on the banks of the meandering Balason river that flows within a distance of 2 to 3 kilometres from the University campus, one gets the impression that NBU has slowly grown into a legend, just like the river itself. Both Balason river and NBU have become intertwined with the lives of the people of North Bengal and of the society itself. This article is finished with a few lines of a self-made poetry.

'*Quiet flows the Balason*
near the campus of the University
and with the passage of time
as the water of Balason flows on
***the glowing legacy of both continues* on...'**

References

[1]Anindya Paul (2011), *Smritipate Uttarbanga Bishwavidyalaya*, Reflections, Golden Jubilee Celebration 1962-2011, The University Press, The University of North Bengal: Siliguri, p. 3.

[2]Minakshi Chakraborty (2011), Editor's Note, Reflections, Golden Jubilee Celebration 1962-2011, The University Press, The University of North Bengal: Siliguri.

[3]*Ibid*.

[4]Manas Dasgupta (2011), *The Early Period of North Bengal University*, Reflections, Golden Jubilee Celebration 1962-2011, The University Press, The University of North Bengal: Siliguri, p. 9.

[5]Ibid.

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পুর্তি প্রসঙ্গে দু-চারটি কথা

নিরোদ সিংহ
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি

কিছু কিছু বিষয় আছে যা ভাবতে ভাল লাগে। এমনকি লিখতে ও ভাল লাগে। তবে এই ধরনের ভাবনা-আবেগ জড়িত ভাবনা নয় বা কাল্পনিক ভাবনাও নয়। বলা যেতে পারে শুধু মাত্র স্মৃতি বিজড়িত কিছু ঘটনা যা মনে রাখার মতো। জনসমক্ষে, জনদরবারে আলোকিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই পুরানো কালের নজির সৃষ্টিকারী বৃত্তান্ত। চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কোন সময়ের জন্য ভাবিনি সমিতির বয়স ৫০ বছর হতে যাচ্ছে। এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে কিছু লেখার সুযোগ সামনে হাতছাঁনি দিবে। ভালো লাগছে তাই কিছু লিখছি। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না, এই সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে সমিতির বর্তমান নেতৃবৃন্দ। তাই তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই তাদেরও যারা সমিতির জন্মলগ্ন থেকে, সমিতিকে চোখের মণির মতো আগ্‌লে রেখেছিল। আর ও ভাল লাগছে এই অনুষ্ঠানের কথা জেনে। কারণ এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো। অনেক সহকর্মী বন্ধু আছেন যারা অনেকেই কবিতা লিখতে পারেন, গল্প লিখতে পারেন বা প্রবন্ধ লিখতে পারেন। তাদের লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে অনেক কিছুই। ফলে উজ্জ্বলময় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান নেতৃবৃন্দ। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে চাকুরিতে যোগদান করে প্রায় চল্লিশ বছর চাকুরি করেছি, ফলে বহু বছর সমিতির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে সেই সময়কার সমিতির অবস্থান আর আজকের অবস্থান এক নয়, আকাশ-জমিন তফাৎ। সমিতির জন্মলগ্নের কথা তারাই বলতে পারবেন, যারা সমিতির জন্মলগ্ন থেকে নেতৃত্বে ছিলেন। তাদের কাছে শুনেছি বা জেনেছি, তাই বলছি ১৯৬৬ সালের ২৩ শে মে আমাদের সমিতির পথ চলা শুরু হয়। আজও থেমে নেই। চলছে তো চলছেই, মাঝে মধ্যে ছোট বড় অনেক ধরনের আঘাত এসেছে, কিন্তু সমিতি মাথা নীচু করেনি। অতীতে এটা দেখা গেছে কিছু চক্রান্তকারী সমিতিকে টুকরো করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু সমিতির ঐক্যের কাছে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৭৫ সাল খুব মনে পড়ে সমিতির নেতৃত্বে মিটিং হচ্ছে সাধারণ সভা হচ্ছে, অনেকে সমিতির সাধারণ সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না কি হচ্ছে, কারণ হিসাবে বলা যায়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নতুন কর্মী, সমিতির নতুন সদস্য, তারপর আসতে আসতে সব কিছু বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছি। বুঝেছি, চাকুরি করতে গেলে সমিতির সদস্য হতে হয়। সমিতিই আমাদের অভিভাবকের মতো কাজ করে। চাকুরি জীবনে চাকুরি স্থলে, আপদে-বিপদে এই সমিতিই রক্ষা করবে এই সব কথা আজও মনে আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ইউনিয়ন থাকলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইউনিয়ন ছিল, ফলে আমরা গর্ব করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের সমিতির হুঁঙ্কারে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। যখন দেশে

বা রাজ্যে কঠিন সময় ছিল, যে কোন মুহূর্তে চাকুরি চলে যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার জন্য আন্দোলন করা যায় না, কিন্তু আমরা নির্ভয়ে আন্দোলন করেছি, এ যেন হিংস্র বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করার মত এবং এই আন্দোলন একদিন-দুইদিন নয়, এই আন্দোলন ছিল ৩৭ দিন। বেতন পাওয়া যায়নি। বাকীতে অনেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়েছে সমিতির নেতৃত্ব। একটা সময় ছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের নাম মাত্র বেতন ছিল। এখন যা পাই তখন তা ছিল না। হয়তো প্রশ্ন আসবে কি রকম ? সঠিক অর্থে বেতন কাঠামো বলতে যা বুঝায় তা হল পরিপূর্ণ বেতন কাঠামো, প্রমোশন পলিসি, সি.এ.এস। অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। এই পূর্ণাঙ্গ বেতন কাঠামো চালু হয়েছে ১৯৭৭ সালের পর। সরকার কর্মচারীদের কথা ভাবতো সেই সময়। এই বিষয়ে আমাদের কর্মচারী সমিতি সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের অবদান মনে রাখার মতো, সঠিক অর্থে বলতে পারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হয়তো আজকে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন কেন ? ২০১২ সালে আমরা ৪৯ দিন আন্দোলন করেছি হ্যাঁ এটা ঠিক কিন্তু সেই সময়ের আন্দোলন আর ২০১২ সালের আন্দোলন ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন অর্থ বহন করবে, কারন ২০১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশদের নীতি চালু করেছিল অর্থাৎ কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি কর এবং শাসন কর। ফলে সমিতির কিছু সদস্য আমাদের আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, এক্ষেত্রে আরও প্রচার করা হয়েছিল সমিতির আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দিয়েছে। ২০১২ সালের ৪৯ দিন আন্দোলনের সাফল্য যতটা হওয়ার কথা ছিল তা সুকৌশলে করতে দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয় রাজ্যে নতুন একটা সরকার আসার পর কিছু রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু কর্মচারী বন্ধুদের বিপথে পরিচালিত করেছে। একটা সময় ছিল শূন্যপদ পুরনের দাবিতে জোরদার আন্দোলন হয়েছে। জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধি পেলে ডি.এ. ঘোষণা হোত অর্থাৎ ডি.এ. পাওয়া যেত আর সময় মতো ডি.এ. না দিলে আন্দোলন হয়েছে এবং আন্দোলনের ফলে ডি.এ. পাওয়া গেছে। বর্তমানে আন্দোলন করার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। ফলে সমিতিকে তৈরী হতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই কর্মচারী বন্ধুদের সামনে। পরিশেষে সমিতির ৫০ বছর বর্ষ পুর্তি উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

প্রথম সহ-সভাপতির কিছু কথা

অশোক কান্তি ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সভাপতির পদ একটি গুরুত্বপূর্ন পদ। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথমে এর সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেই সময় লাইব্রেরিতে কর্মরত রনেন মুন্সী মহাশয় প্রথম সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়ানে আমি এই পদে অধিষ্ঠিত হই। এই পদে অধিষ্ঠানের পর কত যে ঘটনা ঘটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অল্প কয়েকটি ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম।

প্রথমেই যে ঘটনাটি মনে আসছে সেটা হল 'ঘেরাও' এর ঘটনা। তখন ৬০-৯০ টাকায় জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ করা হত। এই প্রথা চালু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইসচ্যান্সেলর। উনি যাওয়ার পর আমরা কর্মচারী সমিতি গঠন করি এবং জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট কর্মচারী সমূহের স্কেলের দাবী করি। কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা উপস্থিত কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করতে বাধ্য হই। সারারাত ভিসির অফিসে ঘেরাও করার পর কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করাই সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য অনুসারে জুনিয়ার অ্যাসিসটেন্ট পদের কর্মচারীদের স্কেল দিতে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল দু'জন কর্মচারী বন্ধুর বরখাস্ত। তা আমরা কখনই মেনে নিইনি এবং সাধারন সভার নির্দেশ অনুসারে আন্দোলনে রত হই। যতদিন কর্তৃপক্ষ দু'জন বরখাস্ত কর্মচারীকে পুনর্নিয়োগ না করে ততদিন পর্যন্ত আমরা সমিতির পক্ষ থেকে আন্দোলন চালিয়েছিলাম।

তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিন যখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'নক্‌শাল' আন্দোলন শুরু হল। তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে অভিনব উপায়ে আন্দোলন ভাঙার খেলা শুরু হল। পূজোর ছুটির এসে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষনা-বেক্ষন বিভাগে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। প্রচুর গার্ড, একজন সুপার ভাইজার, একজন সিকিউরিটি অফিসার ও ক'জন কুখ্যাত লোক নিয়োগের মাধ্যমে নকশাল আন্দোলন দমন করার চেষ্টা চলছে। আমাদের সেই সময়কার কর্মচারী সমিতি ভাঙার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্মচারী সমিতির বহু সদস্য নতুন সমিতির সদস্য হয়েছে। এমনকি এই অধমকেও নতুন সমিতির সদস্য হিসাবে প্রচার করা হয়েছিল। আমি যে পুরানো সমিতিতেই আছি তা নিজেকে লিখিতভাবে জানাতে হয়েছিল। সেই সময় আমাদের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৭৮ জন।

এমন কত ঘটনার সাক্ষী হয়ে আমার সভাপতি জীবন কেটেছে তার শেষ নেই। অবশেষে ০২/১২/১৯৮০ সালে অ্যাসিসটেন্ট কন্ট্রোলার পদে আসীন হওয়ার পর অনিচ্ছা সত্বেও সমিতির সদস্য পদ থেকে বঞ্চিত হই।

কর্মচারী সমিতির সদস্য না হয়েও বিভিন্ন কর্মচারীদের যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেয়েছি তা আজীবন মনে থাকবে। অবসর জীবনেও অশিক্ষক কর্মচারীরা যে ভাবে আমাকে নিয়ে ভাবে ও সম্মান করে তাতে আমি ভীষন আপ্লুত হই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী সমিতি আরও সমৃদ্ধিশালী হোক এই প্রার্থনাই করি।

চা-গাছ

অজিত কুমার চক্রবর্তী

প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড। অনু, পরমানু, কীট্, পতঙ্গ, জীব, জন্তু সর্ব্বোপরি 'মানুষ'। পাহাড় পর্ব্বত, ঘন জঙ্গল, নদনদী, সমুদ্র, প্রকৃতির অকৃপণ দানে পৃথিবী গড়ে উঠেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আরও কিছু দেখবার জন্য, ভোগ করবার জন্য জীবকুলের চেষ্টার ত্রুটি নেই। প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষই বুদ্ধিসত্তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধিক ভাবধারায় বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আল্লার প্রতি বিশ্বাস, সর্ব্বোপরি পৃথিবীর সব ধর্ম্মাচরণের প্রতি বিশ্বাস থেকে এই মানবজাতি নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

বিশ্বাস করি বা না করি একটা ছোট্ট ঘটনা আমাদেরকে অর্থাৎ মানব জাতিকে এক বিশাল প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। আজ সেই বিবরণ লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। হয়তো এটা একটা 'মিথ্' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'মিথ্' হিসেবে গ্রহণ করলেও আমার কাছে হয়ে উঠেছে এক বিস্ময়কর প্রতীক! কি সেই 'মিথ্', কি 'সেই প্রতীক', তার ছোট্ট ছোট্ট বিবরণ আপনাদের অর্থাৎ পাঠক, পাঠিকার সামনে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করছি।

চা-গাছের সৃষ্টি বর্ণিত প্রবাদকে মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টির ষষ্ঠ শতকের আগে 'চীন' দেশে চায়ের প্রচলন ছিল না। প্রবাদ বচন অবশ্যই পাঠককুল গ্রহণ অথবা বর্জন এর মধ্যবর্ত্তি স্থানে রেখে স্থান নির্ব্বাচন করতে পারেন। খৃষ্ট জন্মের অন্তত চার শত (৪০০) বৎসর আগে থেকে চীন দেশে চায়ের প্রচলন ছিল। সেই সময় 'চা-পাতাকে' চীন দেশে ব্যবহার করা হত সবজি হিসেবে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চীন দেশ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন 'পল্লব রাজ' 'কজুসার' তৃতীয় পুত্র 'জর্ম'। এই রাজকুমার জর্ম তাঁর মনের ইচ্ছা সে ধর্ম্মযাত্রায় চীন দেশ পাড়ি দেবেন। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে সীমান্ত পেরিয়ে চীন দেশ। দুর্গম পাহাড় বেষ্ঠিত, গভীর জঙ্গল পরিভৃত সে পথ। রাজকুমার 'জর্ম' জানতেন যে পথ বলে কিছু নেই। লতা, গুল্ম, জঙ্গল সরিয়ে তাকে পথ তৈরি করে নিতে হবে। ব্যবসায়ী মানুষজন একটা পথ ব্যবহার করেন সত্য, তবে সেই পথ অনেক ঘুর পথে যেতে হবে। যে কারণে ঐ পথে না গিয়ে তার যাওয়ার পথকে সংক্ষিপ্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কারণ, যে কারণে তার এই যাত্রা সেই বৃহৎ কাজকে অগ্রাধীকার দিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি অগ্রসর হতে চান। জ্ঞানী 'মহাপুরুষ জর্ম' জানতেন হয়তো এক মনুষ্যজন্মে তাঁর এই কাজ সম্পন্ন নাও হতে পারে! মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ম্মান করে থাকে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে একোনিষ্ঠ জর্ম বিপদসঙ্কুল পথ জেনেও বিচলিত হননি। বোধীসত্তের আশীর্ব্বাদ নিয়ে অবশ্যই পৌঁছবেন তিনি চীন দেশে। অতি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ এই দেশ, বৌদ্ধধর্মকে অত্যন্ত আন্তরিক ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেছে। এতদ্সত্ত্বেও ধর্মে প্রচার সর্ব্বব্যাপী হয়নি বলে তাঁর মনে হয়েছে। বুদ্ধের পথই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ এবং তাঁর মতই শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ। একমাত্র বুদ্ধে অনুরাগী মানুষই শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে বলে 'জর্মের' বিশ্বাস। 'পল্লব রাজ কজুসা' তাঁর তৃতীয় পুত্রের এই সিদ্ধান্তে খুশী হয়েছিলেন। দানশীল ও ধর্মপরায়ন রাজা 'কজুসা' বিশ্বাস করেন বুদ্ধের সুযোগ্য অনুগামী এই রাজকুমার পৃথিবীতে তার অমর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে। রাজ সিংহাসনের তার প্রয়োজন হবে না। রাজা

‘কজুসা’ উপলব্ধি করেছেন ‘জর্ম’ এই ধরিত্রীর এক সফল মানুষ। অবশেষে পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়পরজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চীন অভিমুখে যাত্রা করলেন ‘জর্ম’। স্বয়ং ‘বুদ্ধ’ বিচিত্র প্রাণীর ছদ্মবেশে সঙ্গ দিলেন রাজকুমার ‘জর্মকে’। জর্মকে সাপে দংশন করেনি, ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হননি, হস্তি দ্বারা পদাঘাতে পিষে জাননি। তিনি নির্বিঘ্নে চীন দেশে পৌঁছে গেলেন। চীন সম্রাট ‘উ’ পরম আদরে গ্রহণ করলেন ‘জর্মকে’। মহামান্য সম্রাটের সহায়তায় আপন ব্রত পালনে ব্রতী হলেন। জ্ঞানী রাজকুমার ‘জর্ম’ ছিলেন সু-দর্শন এবং বহু বিদ্যায় অধিকারী। বহু শাস্ত্র করায়ত্ব তাঁর। অতি দ্রুত চীন দেশে তিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন। বহু অনুগামী হল ‘জর্মের’। বহু অনুগামী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। অবশেষে একদিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। শিষ্যদের হাতে প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা শুরু করলেন। আরও জ্ঞান চাই, আরও আলো চাই।

প্রথম তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মৌন হয়ে যান। তারপর তিনি আহার ত্যাগ করলেন। সবশেষে পরিত্যাগ করলেন নিদ্রা। দু-চোখের পলক পড়ে না। ‘জর্ম’ অনড়, অচল, অবিচল সাধনায় নিজেকে নিমোজ্জিত করলেন। দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্তিতে বিমর্ষ চিত্ত হলেন জর্ম। নিজের অজান্তে নিদ্রাভিভূত হলেন। তিন দিন, তিন রাত পর জেগে উঠলেন ‘জর্ম’। নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেললেন। কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্যাঘাত ঘটায় নিজের প্রতি ঘৃণায় ক্রোধে, দুঃখে এবং উন্মাদনায় কেটে ফেললেন তাঁর নিজের দুই চোখের পাতা! প্রচণ্ড অবসাদে যখন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, মন ক্লান্ত, ‘জর্ম’ রক্তাক্ত দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি দেখলেন তাঁর চোখের কাটা পাতা দুটো থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন রকম গাছ। মনের ভেতরে যেন বুদ্ধের আদেশ শুনলেন। ... ‘পান করো! ঐ পাতার রস্ পান করো! তোমার সকল ক্লান্তি, সকল অবসাদ, সকল যন্ত্রণা অন্তর্হিত হবে!’ ‘জম’ খেলেন সেই পাতা। নিমেষে তাঁর শরীরের সকল যন্ত্রণা, ক্লান্তি এবং অবসাদ অন্তর্হিত হল। তাঁর মন আনন্দে পরিপূর্ণ হল। তিনি শিষ্যদের কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করলেন এবং ‘বুদ্ধের’ অপার করুণায় চীন দেশে এই পাতার ব্যবহারের প্রচলন করলেন। পৃথিবীতে ‘চায়ের’ জন্ম হল।

‘চা’ সম্পর্কে চৈনিক দার্শনিক ‘কন্‌ফুসিয়াস’ বলেছেন - ‘‘যদি তোমার গৃহে আসেন অতিথি, আর বলেন তিনি তৃষ্ণার্ত, তাহলে দিও তাঁকে এক পেয়ালা ‘চা’।’’ শিশু জন্মের পর থেকে ‘মা’ যেমন শিশুকে আগলে রেখে তার সন্তানকে পরম স্নেহে লালন পালনে তাকে বড় করে তোলবার জন্য সচেষ্ট হয় তেমনি জন্তু জানোয়ার থেকে শুরু করে কীট্ পতঙ্গ সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় তাদের সন্তানকে অত্যন্ত সযত্নে তাকে বড় করতে। ‘চা’ গাছের ক্ষেত্রেও ঠিকই একই প্রক্রিয়ায় চা-গাছের নার্সারি বেড তৈরি করা হয়। শিশু চারা গাছের জন্য খড়ের ছাওনি অতিমাত্রায় রোদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য, অতিমাত্রায় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তৈরি করা হয়। দুই ফুট, আড়াই ফুটের গাছ হয়ে গেলে তাকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে নতুন করে ব্লক তৈরি হয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় মল-মাটি ইত্যাদি সহকারে রোপণ করা হয় এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই চারাগাছ গুলোকে বড় করা হয়। যখন এই গাছ গুলো পাতা ছাড়তে শুরু করে সেই সময় ‘সুপারভাইজার’ যিনি থাকেন তার নির্দেশে অনুসারে সেই গাছগুলো থেকে পাতা সংগ্রহ শুরু হয়। এক একটা চা-বাগান যেগুলো ছোট সেগুলো ৩০০ শত একরের বাগান যেমন তেমনি ২/৩ হাজার

একরের বাগানও আছে। খুব বড় বাগান হলে সেগুলো ২/৩ টা ডিভিসনে ভাগ করে দেওয়া হয়। বড় চা-বাগানগুলো নিজেদের তদারকির সুবিধার জন্য ২/৩টা ডিভিসন-এ ভাগ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে সারা বৎসরই চা-এর পাতা গাছ থেকে তুলে ফেক্টরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ অধিকাংশ চা-বাগানগুলো জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। শীতকালের ২/৩ মাস বাদ দিয়ে প্রায় ৯ মাসই চাপাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে চা প্রস্তুত করা ফেক্টরীতে পাটানো হয়ে থাকে। যেখানে চা প্রস্তুত হবে। ইদানিং কালে চা-বাগানগুলোতে প্রায় ৮/৯ মাস চা প্রস্তুত হয়। উন্নত মানের যন্ত্রপাতি দিয়ে ফেক্টরীগুলো তৈরি হয়েছে। পুরোন আমলের যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় বেশ কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। ফারমেনটেশন রুম যেমন বদলে গিয়েছে। আধুনিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে ঠাণ্ডা ঘর যেটা ছিল তার পরিবর্তন করে সেই রুমকে আধুনিকিকরণ করে ফারমেনটেশন করা হয়ে থাকে। চা শ্রমিকেরা চা-বাগিচাগুলো থেকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি যেমন আমরা বলে অভ্যস্ত তেমন বাস্তবে মরসুমের সব সময় সেটা সম্ভব হয় না। প্রাইমারী গ্রেড-এ হয়তো কোন কোন কোম্পানি করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে বৎসরে সব সময় সম্ভব হয় না ব্যবসার কারণে। মরসুমের মাঝামাঝি সময় ব্যাপক ভাবে চা-এর পাতা বাগিচাগুলো থেকে তুলে ফেক্টরীতে নিয়ে এসে চা প্রস্তুত করে ফেলে। প্রথমত চাপাতা তুলে এনে ওয়েদারিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওয়েদারি ং নিদৃষ্ট সময় অনুযায়ী হয়ে যাবার পর সেখান থেকে রোলার দেওয়া হয়। রোলার পাতাগুলোকে কেটে ফেলে। সেই কাটা পাতা নিয়ে যায় ফারমেনটেশন রুমে। সেখানে নিদৃষ্ট সময় রেখে সেখান থেকে বয়লারে নিয়ে যায়। বয়লারে যাওয়ার পর সেগুলো ফ্রাই হয়ে যায়। ফ্রায়েড পাতাগুলো কাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সটিং রুমে। তারপর সর্টিং রুম থেকে বেরোনর পর সেগুলোকে ক্লিয়ারিং করে ড্রাম্প করে রেখে দেওয়া হয়। এরপর গ্রেডেশন হয়ে যায়। গ্রেডেশন হয় চা-এর সাইজ এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী। যেমন, ও.পি/বি.ও.পি/ড্রাস্ট/চুরামণি ডাস্ট ইত্যাদি...। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুসজ্জিত বাক্সবন্দি হয়ে বাজার জাত হয়। সবুজ পাতা থেকে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চা বাজার জাত হয়ে আমাদের রসনা তৃপ্ত করে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠক, পাঠিকাদের জন্য নিবেদিত হল।

DOWN IN THE MEMORY LANE - A LOOK BACK TO THE 49[TH] GLORIFYING YEARS OF ALL INDIA UNIVERSITY EMPLOYEES CONFEDERATION MOVEMENT

Fazlur Rahaman
National Executive Member, AIUEC
Vice-President, JCA (WB)

In the year 1967, with the initiation taken by Com S.P. Misra, AIUEC started its journey from Lucknow. Gradually with the passage of time today after 49 years of its long journey today AIUEC has reinforced to fortify itself and its base in almost all the Universities of India. Stretching from Kashmir to Kanyakumari & Gujrat to West Bengal it has its influence & Membership in almost the entire nation and within all the campus of India. This paper is an attempt to look back down in the memory lane and light up the glorifying journey and history of AIUEC in its ever ending and uncompromising dedication and devotion for the welfare of the University employees and uplifement of higher and quality education in India.

The AIUEC is the biggest trade union in the field of higher Education in India. It has occupied a special place not only in the field of higher education but also in all the strata's of the field of education, because of its centrifugal force of always trying to include all of them in our activities to safeguard the education sector from impact of various internal and external factors like Globalization, Liberalization & Privatization.

Com. George Fernandes was the Founder President of the All India University Employees Confederation. He remained as President till 1995 and after that Com. Bhabani Shankar Hota took over as the president of the Confederation. The first Secretary General was Com. S.P. Misra of Lucknow University who continued till 1973. Com. Anil Roy Choudhury of Gauhati University, Assam continued as Secretary General from 1973 to 1977, Com. Bhabani Shankar Hota of Sambalpur University continued as Secretary General from 1977 to 1995 and Com. Sunil Dasgupta of Calcutta University continued as Secretary General since 1995. Com. M.B. Sajjan has been elected as Secretary General of AIUEC at 9th National Conference at Vijaywada, Andhra Pradesh in the month of May 2005 and continuing till date.

After amendment of the Constitution and cratin of a post of the Working President in Allahabad Conference in 1977, Com. Anil Roy Choudhury was elected as the first Working President. He continued till 1995 and Com. Nirmal Kumar Mishra was elected as the Working President in 1995 whereas Com. Suresh Chandra Mishra was elected as the Working President at the Lucknow Conference in 2007 and continuing till date.

The first joint secretary was Com. Biraja Shankar Hota followed by Com. Shrabani Sengupta of Jadavpur University who is continuing till now.

During the last 49 years the AIUEC conference were held at the following cities :

1967	Lucknow	1971	Bombay	1975	Guwahati	1979	Calcutta
1983	Sambalpur	1987	Allahabad	1991	Rewa	1995	Calcutta
1999	Guntur	2003	Vijayawada	2007	Lucknow	2011	Udaipur

The present AIUEC conference will be held on 2015 at Kakatia University, Warangal (Telangana).

The National Executive Council Meeting of the AIUEC were held at the following cities :

Lucknow University, University of Bombay, Sambalpur University, Andhra University, Visakhapatnam, Calcutta University, Nagarjuna University, Guntur, A.P., Gulbarga University, Karnataka University, A.P.S. University Rewa, M.P., Rajasthan University, Jaipur, Gauhati University, Mysore University, Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Meerut University, Raipur University, Raipur, Jabalpur Agriculture University, Andhra University, Allahabad University, Kalyani University, University of Burdwan, Kakatiya University, Warangal, North Maharashtra University, Jalagam, Guru Ghasidas University at Bilaspur, Kannanur University, Kerala, M.S. University at Udaipur, Sambalpur University, Bangalore University, Aligarh Muslim University.

Highlights of some important activities of AIUEC :

AIUEC has launched various struggles for attaining certain vital demand of the employees of Universities such as UGC pay-scale, representation in Senate/Court and Syndicate/Executive Council, against contractual/daily wages/temporary/contract type of recruitment, for right to strike against FDI & commoditization of higher education etc. Along with these demands, AIUEC has also the glorious history of fighting for the cause of suffering people of India in general and working class in particular. During 1980's AIUEC fought against the Draconian ESMA bill brought out by the then Govt. at the centre. AIUEC also fought against the "Dictatorial Emergency" imposed on the people of this country in June, 1975. During the 1970's AIUEC also fought against oppression on University employees like protesting against the death of employees in police firing in Kurukshetra University. AIUEC strongly fought against brutal police lathi charge on Honda workers at Gurgaon (Haryana).

The Confederation organized a "Mass Dharna" in 1980 at the boat club in front of the Parliament to draw the attention of the Union Government on the 22 points charter of demands adopted in the National Council meeting held at Gauhati University. The Confederation participated in large number in the rally against the anti-working class Industrial Relations Bill in 1978 and 1981.

The Confederation organized a National Convention on "Hospitals and Other Institutions Bill" at New Delhi in 1982 with the participation of employees' leaders from Hospitals, Khadi Commission and Universities and also teachers from various Universities. This Bill sought to take

away the right of the employees of these organizations and provided for separate mechanism for settlement of grievances outside the purview of the Industrial Disputes Act.

The Confederation organized a massive demonstration of the University employees at New Delhi in front of the University a massive demonstration of the University employees at New Delhi in front of the University Grants Commission office in 1981 and the Chairman of the UGC was compelled to invite a delegation of the Confederation to discuss basic problems of the University employees of the country.

On several occasions, All India Demand Day, One Day Token strike, Unit level demonstrations were successfully organized. Several State Federations went on long strike supported by the Confederation.

Three significant developments took place in between which need to be mentioned. Two historic rallies of University employees were organized to "March to Parliament" from the Gandhi Maidan in 2007 and 2010 and a national seminar was organized at Nehru centre of the Jawaharlal Nehru University at 35, Firozshah Road, New Delhi. The Rally was addressed by leaders of various political parties in the Parliament and the Seminar was addressed by eminent thinkers, intellectuals, political leaders and more so by the then Chairman of the University Grants Commission.

On 25th - 26th October, 2013 the National Executive Committee Meeting was held at Tripura University, Agartala. The following three important programme were adopted and AIUEC successfully organized all programmes i.e. "Swabhiman Yatra - 2", Delhi Chalo on 05.03.201. Rallies in all the capital cities of different states of the country on 15.02.2014, were the Non-Teaching employees of all the Universities in that state assemble in their state capital, demanding UGC Pay-Scales, representation in Senate-Syndicate, Executive Committee, Boards of regents, courts and etc. Contract/Temporary/Casual/Daily Wages type of recruitments. A memorandum also submitted to the HRD Minister, New Delhi, through respective state Chief Minisers/State Higher education Minister.

The AIUEC expressing solidarity with the victims of devastating Phalin of Odisha-Uttarakhand, where our delegation went to relief camps and distributed relief materials.

On 19-20 September, 2005 National Executive Meeting held at Gauhati University. The most important decision was to bring out confederations quarterly journal "Call for Struggle" immediately. The following publication cell was constituted as per the constitution of the confederation. Sri Ch. Hari Babu, NEC Members, Acharya Nagarjuna University, Guntur as elected convenor and executive editor. The following are the members : Sri Siddeswara Goshal (East Zone Secretary, Calcutta University Member), Sri Rajesh Sony (Central Zone Secretary, Member), Sri Shammi Aktar (Aligarh Muslim University, U.P.). Ex-officio Members are Sri B.S. Hota (President, AIUEC), Sri M.B. Sajjan, (Secretary General, AIUEC). Ch. Hari Babu, convener and executive

editor was authorized to appoint associate editors and other editorial board members of his choice to carry out the day to day activities of the journal. After Lucknow conference the journal name was changed as "Voice of University Employees". Now the magazine was continuously publishing from August, 2006 onwards.

The Confederation was concentrating from the very beginning to achieve the following demands:

1. Trade union rights to the University employees under the labour legislation of the country.
2. Democratization of University Administration so as to give representation to University employees.
3. Uniform pay-scale and service conditions with uniform retirement benefits such as contributory provident fund, pension and gratuity.
4. Housing to the University employees.
5. Dearness allowance with full neutralization of rising cost of living.
6. Over time allowance for working beyond the working hours.
7. Give jobs or unemployment allowances to the jobless.
8. End all victimizations for trade activities.
9. Leave travel concession, medical allowance and or treatment, housing allowance and conveyance allowance.

<u>Some Major Demands of All India University Employees Confederation</u>

1. "UGC pay review committee" which is already constituted in consequence of 6^{th} Pay Commission, should also recommend pay scales and service conditions of Universities Non-Teaching Employees as is done in case of teachers and officers.
2. Retain the autonomy of Universities and democratize University Acts ensuring adequate representation from all sections of the society including the non-teaching employees in the decision making bodies of the Universities.
3. Change the anti people policies of the Central Government.
4. Recruitment of permanent staff to stop random contractual/agency system of appointments and Regularised by adjusting Daily Wagers, Contract Workers, NMR's working in the Universities for the last 5 years.
5. More funds from Central Government State Government and UGC to the Universities and to increase budget allocation for education sector.
6. To enact Central legislation to control self financing colleges and ensuring social justice to socially and economically backward students.
7. Stop undesirable and unjustified activities of NAAC.
8. To stop conferring deemed university status to unqualified intuitions.'

9. Resist the all-out self financing policy in academic institution.
10. Central legislation for safeguarding the right to strike.
11. Stop victimization of trade union leaders and workers.
12. Stop anti-employees new pension scheme.

AIUEC Working President Com. Suresh Chandra Misra delivered his lecture, Com. MB Sajjan, Secretary General & other members of AIUEC including Com. Sitaram Yechuri, Hon'ble Member of Rajya Sabha on dais in the "Swabhiman Yatra - 2", Delhi Chalo on 05.03.2014 at Jantar Mantar, New Delhi

Employees of different Universities in India attend in the "Swabhiman Yatra - 2", Delhi Chalo on 05.03.2014 at Jantar Mantar, New Delhi

NBU Employees participated "Swabhiman Yatra - 2", Delhi Chalo on 05.03.2014 at Jantar Mantar, New Delhi

কর্মচারী সংগঠন প্রসঙ্গে নতুন চিন্তা

মনতোষ ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুরনো সব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, প্রয়োগ-পদ্ধতি সমস্ত কিছু আর একবার ফিরে দেখার, নতুন করে সবকিছু ভাবার জন্য সময় আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প-কলা, বাণিজ্য সমস্ত কিছু নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ট্রেড ইউনিউনও তার পথ খুঁজে চলেছে। ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও নতুন ধারা এসেছে। এই অজানা অচেনা পথে আমাদের চলতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী সংগঠনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই রচনার মূল লক্ষ্য আগামী দিনে কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের অগ্রণী ভূমিকার রূপরেখা নির্ণয়। বহু আন্দোলনের সাক্ষী এই সংগঠন। সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। চলতে চলতেই নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরনো অভিজ্ঞতার দর্পণে বিশ্লেষণ করে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষার মত একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন সংঘটিত করার ক্ষেত্রে কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এই খোলা হাওয়ার প্রভাব থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারে না। তাই আমাদের আধুনিক চিন্তায় বলীয়ান হতে হবে।

আমাদের অনেক শিখতে হবে। কায়েমী স্বার্থকে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে, মনে সাহস সঞ্চার করে নিজের মনভাব ব্যক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে-কাঙ্খিত দাবি তখনই পূরণ হয় যখন অঙ্গীকার, ভয় মুক্ত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় আইন এবং তার পরিভাষা আমরা যারা ইউনিয়নে প্রথম সারিতে থাকতে চাই তাঁদের জানা উচিৎ। রাজনৈতিক নীতিগত অবস্থান তত্ত্ব এবং তথ্য দ্বারা উপস্থাপন করলে কর্মচারীরা সমৃদ্ধ হবে। ভিন্ন মতাদর্শকে সম্মান প্রদর্শন সংসদীয় গণতন্ত্রের শালীন প্রথা। এতে গণতন্ত্র পুষ্ট হয়, পারস্পরিক মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। যুক্তিকে আশ্রয় করে বিনম্রভাব বজায় রেখে, উদ্ধত আচরণ পরিহার করে সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতাকে আরো সমৃদ্ধ করলে আমরা প্রগতির প্রশস্থ পথে চলতে পারবো, এই আত্ম-প্রত্যয় আমাদের রয়েছে।

পরিশেষে শিক্ষাকর্মীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করার ধারাবাহিক প্রয়াস জারী রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। কাজ কর্মে একঘেয়েমী দূর করার জন্য ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে আরও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিৎ। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে যে কোনো সদর্থক শুভ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

একটি ছোট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সুব্রত রায়, রসায়ন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

এবারের ভ্রমণ বৃত্তান্তটি সুদূর সিকিম রাজ্যের 'হিলে ভারসে'। পশ্চিম সিকিমের প্রায় শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ইন্দো- নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত সেই 'হিলে ভারসে'। পাহাড়ী ছোট্ট জায়গা যা অনেক ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে অতি পরিচিত নাম। ঠিক অবস্থানটা এই রকম যে পাহাড়ের চুড়ায় সান্দাকফু অবস্থিত, তাঁর বিপরীত মেরুতে অর্থাৎ পাশের পাহাড়েই অবস্থিত 'হিলে ভারসে'। আরও পরিষ্কার করে বললে জোরেথানি সাব ডিভিসনের শহরটি থেকে বেশ খানিকটা উপরে একেবারে পশ্চিম প্রান্তে।

'হিলে' এবং 'ভারসে' দুটো আলাদা জায়গার নাম। দুটোর মধ্যে দূরত্ব খুব একটা বেশি না হলেও, অবস্থানগত পার্থক্য অনেক এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বিচারেও তাদের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা গেছে। সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রায় সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা ক'জন মিলে আমাদের এক সহযাত্রীর প্রাইভেট কার (সদ্য নতুন) করে শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে সোজা পাহাড় মুখী। সেবক পাহাড় পেরিয়ে পরিচিত সেই তিস্তার ধার ধরে পথ চলা। বাংলা-সিকিম সীমান্তে চেক পোস্টে গাড়ী থামিয়ে রুটিন চেকিং। ৫-১০ মিনিট বিরতির পর আবার গাড়ী ছুটলো আবার উপরের দিকে। কিছুদূর পথ চলার পর আবার আমাদের গাড়ী থামল। উদ্দেশ্য শিবমন্দির দর্শন এবং একটু বিশ্রাম নিয়ে, গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আবার খানিকটা যাত্রার রসদ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। মন্দিরের পাশে একটাই মাত্র ছোট্ট দোকান। মল্লীর (একটি স্টপেজ/ছোট্ট, শহর) ঠিক কয়েক কিমি আগে। নদীর ধারে, রাস্তার পাশেই শিবমন্দিরটি। চমৎকার পাহাড়ী মন্দির। বেশ সাজানো গোছানো। ভক্তিভরে সকলে প্রণাম ও মন্দির দর্শন শেষে আবার যাত্রার শুরু। সময়টা ঠিক জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ। সমতলে তখনও শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও, পাহাড়ে স্বাভাবিকভাবে সারা বছরই শীতের প্রকোপ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে অথবা বর্ষার শুরুতে সামান্য একটু পারদের ঊর্ধ্বমুখী ভাব লক্ষ্য করা যায়। বেলা ২.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা পৌঁছলাম জোরেথাং শহরে। বেশ ঠাণ্ডা এবং পড়ন্ত বেলায় মিঠেল রোদ যেন পরম সুখ। হালকা বাতাস। বেশ খোঁজা-খুঁজির পর গাড়ী রাখার পার্কিং এর জায়গা পাওয়া গেল। ব্যাস্ত শহর। খুব জোর খিদে পেয়েছে। হোটেলে ঢুকে সরাসরি ভাতের অর্ডার। বাবু-ভাতের জন্য একটু সময় লাগবে। প্রাণে স্বস্তি পেলাম একজন বাঙালি পেয়ে। বললাম- 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি করুণ'। কিছু সময় বাদেই প্রেসার কুকারের সিটি পড়ল। যাক্ আশ্বস্ত হলাম, এবারে ভাত পাওয়া যাবে। চিকেন সহ গরম গরম খাবার, যেন অমৃত সমান। কোন কথা নেই। সকলে পেট পুরে খাওয়া। আমাদের সহকর্মী তথা সহযাত্রী ধ্রুববাবু আগে থেকে কিছুই জানায়নি। কতদূর রাস্তা, কত সময় লাগবে ইত্যাদি। তাছাড়া আমরা বাকী সকলে ঐ পথে নতুন। যাইহোক, খাওয়া সেরে আশে পাশের দোকান-পাট, মার্কেট কমপ্লেক্স, বড় মাল্টিস্টোর কার পারকিং ইত্যাদি মোটামুটিভাবে দেখে শুনে আবার রওনা হলাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। এমনিতেই জোরেথাং অনেক উঁচুতে এবং যত সামনে এগাচ্ছি তত উঁচুতে উঠছি, বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। নিজেদের গাড়ী ফলে আমরা বেশ

স্বাধীন মত যাচ্ছিলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা পৌঁছলাম একটি সেখানকার বিখ্যাত সাইবাবার মন্দিরে। জায়গাটি 'দরমাদন'। পাহাড়ী মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি বড় এবং সুন্দর মন্দির। আমরা ওখানকার মন্দিরের এক পুরোহিত মহাশয়ের কাছে নানা রকম গল্পকথা, মন্দিরের স্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করলেন। আমরা সকলে মন্দিরের চারিপাশ এবং আশে পাশের জায়গা পর্যবেক্ষণ করলাম। সকলকে পুরোহিত মহাশয় প্রসাদ খাওয়ালেন। বেশ ভালো লাগল। তখন ওখানে বেশ ভালো কুয়াশা। যেতে যেতে 'সোমবারি' এবং আরো কয়েকটি পাহাড়ী জনবসতিপূর্ণ লোকালয়। দোকান-পাট, বাজার ইত্যাদি, গাড়ীর স্টপেজও বটে। কোথাও কোথাও ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন। চলতে চলতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। তখন সন্ধ্যেবেলা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। হঠাৎ চোখ খুললে দেখি, আমাদের বাকী সকলে গাড়ী থামিয়ে মালপত্র, ব্যাগ ইত্যাদি নামানো শুরু করেছে। যে লজ-এ থাকবো, তার ঠিক সমানেই গাড়ী দাড় করানো। লাগেজ নিয়ে চট্‌জলদি ঘরে ঢোকা। কারণ বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, ঘন কুয়াশা বহু ঠাণ্ডা বাতাস। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র বাড়িঘর এবং দোকান পাট। আমরা এখন 'হিলে'। 'হিলে' থেকে আরও ১২ কিমি উপরে 'ভারসে'। যথারিতি সারাদিন যাত্রাপথের ক্লান্তি, পাহাড়ী এলাকায় রেওয়াজ মেনে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়া। বিছানা তৈরি। তার ঠিক আগে গ্লাস ভরে চা-কফি এবং স্নেক্স -এর আয়োজন ছিল।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এবং চা-বিস্কুট এবং জলখাবার খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়লাম 'ভারসে' অভিমুখে। সকালের পরিষ্কার আকাশ, ঝলমলে রৌদ্র, প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর পাহাড় যেন এক নতুন জগতে বিচরণ করছি। গাড়ী থামিয়ে মাঝ রাস্তায় কখনও কখনও সেগুলিকে ক্যামেরা বন্দির করা কিংবা খানিকটা ঘুরে বেড়ানো কিছু সময়ের জন্য হলেও সব কিছুকে ভুলে এক অফুরন্ত ফুতি এবং শান্তির বাতাবরণ। প্রায় ১০-১২ কিমি যাওয়ার পর গাড়ী সারাদিনের জন্য পার্কিং করে। ফরেষ্ট-এ ঢোকার টিকিট নিয়ে ট্রেকিং শুরু। প্রায় নয় কিমি রাস্তা গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য সিটও আছে। ঘন জঙ্গলের আবডাল ভেদ করে মিঠেল রৌদ্র ট্রেটিং-এ কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। অবশেষে পৌঁছলাম আমরা ফরেষ্ট -এর প্রায় শেষ প্রান্তে এবং প্রায় সর্বোচ্চ উচ্চ শিখরে। সেখানে শুধু ঘন কুয়াশা এবং মাঝে মাঝে মেঘের খেলা সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মাঝে একটিমাত্র কটেজ/ মরে কেটে ২-৩ টি মাত্র লোক অর্থাৎ কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করেন। সর্বাধিক ৭-৮ জনের ২-৩ দিনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে যদি আগাম বলে রাখা হয়। এমতবস্থায় আমরা ৫ জন বিনা নোটিশ-এ গিয়ে হাজির। ওনাদের অনুরোধ করে কোন রকমে খাবার এবং কিছু সময়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল। সুন্দর পরিবেশ চারিদিক শুধু সবুজ আর সবুজ। পাহাড়ের গা বেয়ে শুধুই 'ফোডেডেনটন' আর 'ফোডেডেনটন' ফুলের গাছ। আমাদের বেড লাক যে সে বছর হাতে গোনা কয়েকটি ফুল ছাড়া সেই বিখ্যাত ফুলটি ছিল না। ফুলটির বিশেষত্ব এটি এক বছর বাদে অর্থাৎ এক বছর হয়, পরের বছর প্রস্ফুটিত হয় না। আগে থেকে জানা থাকলে সুবিধে হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল দার্জিলিং-এর কিছু অংশ এবং সিকিমের খানিকটা অঞ্চল অর্থাৎ পুরো সিঙ্গালিলা অভয়ারান্য অঞ্চলটি 'ফোডেডেনটন' ফুলের জন্য বিখ্যাত। যতদূর সত্য এই অঞ্চলটি নাকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'ফোডেডেনটন পার্ক/ ফোডেডেনটন প্লানটেশন' নামে পরিচিত। ৯-১০ কিমি ট্রেক করার পর স্বাভাবিক ভাবে সকলেই ক্লান্ত।

কিছু সময় বিশ্রাম। এদিক-ওদিক একটু ঘোরাফেরা করে এসে কিছু সময় বাদেই দেখি গরম গরম খাবার রোড। প্লেট ভরে ভাতের আয়োজন। পেট পুরে সকলে খাওয়া সেরে, ১০-১৫ মিনিট বিশ্রাম। তারপর আবার ফেরার পালা। তাড়াতাড়ি না করে উপায় নেই। কারও কখনও হঠাৎ বিপদ হলে অথবা অসুবিধায় পড়লে সেখানে কারও সাহায্য/সহযোগীতা পাওয়া প্রায় মুসকিল। কারণ এমনিতেই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রেকিং তাছাড়া লোক জনেরও আনাগোনা খুবই কম, না ই বললেই ভালো। উপরন্তু অভয়ারণ্যের হিংস্র জীবজন্তুর ভয় তো স্বাভাবিক ভাবে থাকেই। তাই আর দেড়ি না করে আমরা সবাই রওনা হলাম।

তবে ফেরার সময় একটু সুবিধা যে, পরিচিত রাস্তা অর্থাৎ যে পথ দিয়ে যাওয়া আবার সেই পথ দিয়েই ফেরা এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসা। বেশিরভাগ অঞ্চল ঝোপ-ঝাড় বা বুশ মাঝে মাঝে বড় বড় শক্ত কাঠের গাছ, সরু সরু বাঁশ গাছ। প্রকৃতির নিয়মে ছোট ছোট বাঁশ গাছের টুকরো এদিক ওদিক রাস্তায় পড়েই থাকে যা লাঠি অথবা তাতে ভর দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করা খানিকটা হলেও সহজ হয়। তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য তো বটেই। াবশেষে আমরা পৌঁছালাম ফরেষ্ট-এর প্রবেশ দ্বারে অর্থাৎ সকালে যেখানে আমরা গাড়ী রেখে ছিলাম। ফরেষ্ট-এর গেট যিনি বিট অফিসার ছিলেন, উনি বললেন- ‘চা খানি হুনছ দাজু?’ (নেপালী ভাষায়) মনে মনে ‘মেঘ না চাইতেই জল’। তাঁর পরিবারেই একজন সুন্দর চায়ের কাপ সাজিয়ে পরিবেশন করলেন। খুব তৃপ্তি সহকারে চায়ের মজা নেওয়া হল। তখন প্রায় সন্ধ্যে। আমাদের গাড়ী ছুটলো গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রায় ১০-১২ কিমি আবার যেতে হবে তবে লজ। সকাল হলেই শিলিগুড়ি ফেরার পালা। মনটা খুব খারাপ লাগছিল। নিজের বিষণ্ণতায় মগ্ন ছিলাম। মাইলের পর মাইল চলছি, কেন যেন আর কারও দিকে ভালো ভাবে তাকানোর সুযোগই পাইনি। এতো তাড়াতাড়ি সময়টা ফুরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। রাত্রে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া, হইহুল্লোর করে তাড়াতাড়ি ব্যাগ-পত্তর গুছিয়ে শুয়ে পড়া, কিন্তু ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম কয়েক ঘন্টা পেরলেই আবার সেই কর্মময় ব্যাস্ততায় জীবন শুরু করতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লাম, হায়। সময় কি নিষ্ঠুর। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাইরে বেরিয়ে বার বার শুধু আকাশের দিকে চাইলাম। কোথাও যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। সেটি আবার কি রকম? যেমন- জ্যোৎস্নার রাত্রি, চারিদিক পরিষ্কার। আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে, আর যেদিকে দু’চোখ যায় সেদিকে তাকালে মনে হচ্ছিল যেন নিচেও এক একটা সমান্তরাল আকাশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচরণ করছে। জ্যোৎস্নার রাত্রিতে পাহাড়ের অপরূপ সুন্দরতা আমি আগে কখনও দেখিনি। পরদিন সকালে চা-জল খাবার সেরে রওনা হলাম এবং বললাম গুড বাই ‘হিলে ভারসে’ গুড বাই এবং সঙ্গে প্রার্থনা করলাম যদি আবার তোমায় একবার দেখিতে পাই।

আকাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থা

ইন্দ্রনীল রায়, মুদ্রণ বিভাগ, উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়

এক জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কলা খেয়ে খোসা রাস্তায় ঢিল্ দিয়ে ফেলে দেয়। সেই খোসায় পা দিয়ে এক পথচারী পরে যায়। তা দেখে প্রথম ব্যাক্তি পরে যাওয়া ওই পথচারীকে তুলতে কাছে যায় এবং তাকে দেখে চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু বেরিয়ে আসে। হতবম্ব হয়ে প্রথম ব্যাক্তি পথচারীকে বলে প্রভু আপনি! সে কথা শুনে ঐ পথচারী বলে - ভাই তুমি কে ? আমাকে প্রভু বলছো কেন ? উত্তরে প্রথম ব্যাক্তি বলে 'প্রভু আমি হনুমান, আপনার মানু'

পথচারী ঃ হনুমান ? তোমার চেহারা তো হনুমানের মতো নয় ।

হনুমান ঃ Plastic Surgery করিয়েছি প্রভু। আপনি চাইলে বুক চিড়ে দেখাতে পারি।

প্রভু ঃ এ বাবা! তুমি তো দেখছি মর্ত্য লোকের হাব্-ভাব্ শিখে নিয়েছো। চেহারার ওপর চেহারা লাগিয়ে ঘুরছো।

হনুমান ঃ আপনি মর্ত্য লোকে কবে এসেছেন ?

প্রভু ঃ বছর খানেক আগে, ভক্তদের ডাকাডাকিতে আসতেই হল।
আর বলো হনুমান। কেমন আছো ?

হনুমান ঃ কিছু ঠিক নেই। আপনার রামরাজত্ব দেখেছি আর এখন বম রাজত্ব দেখছি।

প্রভু ঃ পূর্বে ভৌগোলিক ছোটো ছোটো প্রান্ত মিলে একটি অখন্ড ভারত দেশ ছিল। আর এখন বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ, জাতি, ধর্মতে বিভাজিত ইন্ডিয়া।

হনুমান ঃ তাতে দোষ কোথায় ? এরাই তো গর্ব করে বলে - "Integrity in Diversity"

প্রভু ঃ যে কোন জিনিস ছোটো হোক তার উপকারিতা আছে কিন্তু যদি তা ভেঙ্গে যায় তাহলে তা আর কাজের থাকে না। অদৃশ্য সীমারেখাতে বিভাজ্য অনেক টুকরোয় ভাঙ্গা এই দেশটা।

হনুমান ঃ প্রভু - যে ভাবে একটি কাজকে ভাগ করে দিলে তা আরো ভালো এবং দ্রুত হয়ে থাকে, হয়তো দেশ বা রাজ্য ভাগ করলে সুশাসন আসে।

প্রভু ঃ শাসন করতে গেলে কাজকে ভাগ করতে হয় আর শোষন করতে হলে দেশ বা রাজ্যকে। দুঃখটা কোথায় জানো মানু, যতো দিন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল, অখন্ড ছিল। যেই দেশের সন্তানদের হাতে আসলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নিজ নিজ স্বার্থ-ধর্মকে ভিত্তি করে দেশকে ভাঙলো আবার ভাষা-জাতি কে ভিত্তি করে রাজ্যকেও ভাঙলো। সবই ক্ষমতার লড়াই, শোষনের উদ্দেশ্যে।

যে ভাবে আমাদের শরীরে দুটি হাত, দুটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ আছে আর মাথা একটি। এখন যদি পাঁচটি মাথা হয়ে যায় তাহলে কোন হাত কি কাজ করবে তা ঠিক থাকবেনা তেমনি অতি শাসক হলে কর্মটা ব্যহত হবে, ভারসাম্য হারাবে।

তুমি দেখবে অনেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তা হলে দেশ চালানোর ক্ষমতাবান মানুষের তো অভাব নেই। তা হলে ছোটো ছোটো রাজ্যের কি দরকার। সু-শাসনের জন্য কাজের সদিচ্ছা দরকার, সদর্থক দৃষ্টি-ভঙ্গি দরকার। বারো ভূতের রাজ্য, তার মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা না হলেও চলে। কথার কথা ভারত বড় দেশ, পাকিস্তান ছোট। তুমি কি মনে করো - ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভারত থেকে আলাদা হয়ে সেখানে কি সুশাসন এসেছে?

হনুমান ঃ প্রভু তা হলে কি করে বোঝা যাবে যে শাসক না শোষক?

প্রভু ঃ শাসক সুশাসন দেবে। অর্থাৎ যে সমাজে ন্যায় ব্যাবস্থা স্থাপন করবে। তার প্রতিটি কাজ মানুষের উন্নতির জন্য হবে , যে কোন ভেদাভেদ করবে না এবং সব সম্প্রদায়ের লোককে একই রকম সম্মান করবে এবং অধীকার প্রদান করবে।

কু-শাসক সবার আগে ন্যায় ব্যাবস্থাকে শেষ করে মানুষের অধীকার কে খর্ব করবে, নিজ-পর ভেদাভেদ, যুক্তিহীন, দূরদৃষ্টি হীন, ব্যাক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করবে। সমাজে ভারসাম্য নষ্ট করে তার পছন্দের প্রজা-জনতার উপর চাপিয়ে দেবে। পছন্দের লোকেদের উন্নতি হবে এবং বাকিদের শোষন।

আকবর একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি সব ধর্মকে একইরকম সম্মান করতেন। কিন্তু তাঁর বংশধর আওরঙ্গজেব ভিন্ন ধর্ম অনুগামীদের উপর অত্যাচার করতেন। আর্থীক উন্নতি দু'জন শাসকের সময়ই হয়েছিল কিন্তু সামাজিক উন্নতি হয়নি।

হনুমান ঃ প্রভু সবাই তো আপনারই সন্তান। তা হলে সবাই কে ভালো কেনো বানালেন না!

প্রভু ঃ ভারসাম্য

হনুমান ঃ অর্থাৎ

প্রভু ঃ আমি অমৃত বানিয়েছি। আবার বিষ-ও আমারই বানানো। ভালো লোক কেন দরকার তার প্রয়োজনটাও আমারই বানানো। দুষ্টু লোক না থাকলে সৎ-ভালো লোকের কদর হবে কি করে। আবার দুষ্টু লোকের ভয়াবহ পরিনতিও আমারই লীলা।

যুগে-যুগে আমি অবতার হয়েছি, কখনো মহাবীর রূপে আবার কখনো যীসু মাসীহা হয়ে, কখনও পৈগাম্বর তো কখনো বুদ্ধ সেজে; আমিই গুরু গোবিন্দ সিংহ আবার আমিই চৈতন্য। সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে।

সত্য শান্তি, সত্য শক্তি, সত্য সুন্দর, সত্য ন্যায়, সত্য ধর্ম, সত্য কর্ম, সত্য ক্রান্তি, সত্য ছাড়া সব ভ্রান্ত। গীতা, বাইবেল, কোরান, গ্রন্থসাহেব , ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যের পথে চলার উপায় দেখিয়ে দিই।

হনুমান ঃ কিন্তু প্রভু , আজযে লোকে গীতা - কোরানের নামে মারপিট এবং দাঙ্গা করছে।

প্রভু ঃ বেশীরভাগ লোক ধর্মকে মানে। তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে সমাজে উন্নতি আনে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কিছু লোক ধর্মকে ব্যবহার করে অনৈতিক ভাবে অর্থ এবং ক্ষমতা দখল করে, যেমন উগ্রবাদী, কিছু অপদার্থ রাজনৈতিক লোকজন ইত্যাদি এবং তারাই হল দুর্জ্জন বা শোষক।

হনুমান ঃ প্রভু সত্য কর্ম, সত্য শক্তি, আবার সত্য ন্যায় কি করে ?

প্রভু ঃ কর্ম করলে সাহস বাড়ে, সাহস শক্তি বাড়ায়, আর শক্তি ক্ষমতা দেয় অধীকারকে রক্ষা করতে, ন্যায় কে প্রতিষ্ঠা করতে।

হনুমান ঃ তা হলে এই দেশের শ্রমিকদের এতো দুরাবস্থা কেন?

প্রভু ঃ ক্রান্তির অভাবে।

ভারতবর্ষ সব থেকে বেশী কৃষক এবং শ্রমিক। সব শ্রমিক সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অধীন। রাজনৈতিক সত্য মানুষের অভাবে শ্রমিকদের এই দুরাবস্থা। দরকার হলে সব শ্রমিক সংগঠন এক হয়ে তাদের এক রাজনৈতিক দল গঠনের। যতক্ষন না তারা এক হবে ততক্ষন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের শোষন করবে এবং তাদের শুধু মাত্র ভোটার হিসাবে ব্যাবহার করবে।

হনুমান ঃ বাঃ! এটা তো অনেক সহজ উপায়, তা হলে এতো দিন হয়নি কেন?

প্রভু ঃ তুমি তো জানোই - বিভীষন অমর।

হনুমান ঃ তা হলে কি প্রভু রাজনৈতিক নেতারাই মুল দোষী?

প্রভু ঃ রাজনীতি শব্দতেই এর মানে লুকিয়ে আছে, এর অর্থ হল নীতি মেনে রাজ্য বা প্রশাসন চালানো। যখনি নীতিটা

সরে যায় তখনই অনৈতিক রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে সমাজের ভালো যে করে তাদের সমাজসেবী হিসেবে গন্য করা হয় আর যারা নিজের ভালোর জন্য সমাজকে ব্যাবহার করে তারা রাজনীতির আশ্রয় নেয়।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই শিখি এবং সেই হিসাবে আমাদের চিন্তা-ধারা বদলাই। বেশীরভাগ লোকেরা অনৈতিক চাহিদা নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আসেন এবং দীর্ঘদিন এমন মানুষদের সংস্পর্শে তারাও অনৈতিক হয়ে ওঠেন। জনগন তারাও কম নয়। তারা তাদের সন্তানের progress report নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত। কোন মাস্টারের কাছে পড়বে, কে syllabus তারাতারি ভালোভাবে শেষ করে সেটা নিয়ে অনেক উদগ্রীব। কিন্তু election এর সময় রাজনৈতিক দলের manifesto নিয়ে কোনো দিন ঘাটাঘাটি করেনা এবং পাঁচ বছর শেষ হলে কতটি কাজ হয়েছে তা-ও মিলিয়ে দেখে না এবং তার জন্যই প্রার্থীকে সঠিক মুল্যায়ন করতে পারে না এবং সে কারনেই সুযোগ সন্ধানী কিছু অযোগ্য লোক শাসন ব্যাবস্থাতে চলে আসে। কিন্তু তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা কর তা হলে মূল দোষী হল দেশের বিচার ব্যাবস্থার সাথে যারা জড়িত। ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী বা ধনী লোকেদের জন্য এক ধরনের বিচার এবং গরীব বা নিরীহের জন্য অন্য। বিচার ব্যবস্থার দেওয়ালিয়াপনের জন্য প্রভাবশালী বা ধনীরা অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়। বর্তমানে দেশে অন্যায় ব্যাবস্থা চলছে।

হনুমান ঃ তা হলে প্রভু উপায় কি ?

প্রভু ঃ যে দেশে ন্যায় ব্যাবস্থা ঠিক নেই সেই দেশের জনতাকে ভুগতেই হবে। দেশের জনগনকে ভালো ভাবে থাকতে হলে অবশ্যই তাদেরকে তাদের দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। নিষ্ঠার সাথে কর্ম করে যেতে হবে। তার দায়িত্ব বোধই তাকে সঠিক কর্ম করতে বাধ্য করবে এবং অধিকার প্রদান করবে অন্যায়ের প্রতি আওয়াজ উঠাতে। সবাই যদি তাদের কর্ম তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে করে যায়, তাহলে অন্যায় শব্দটি আর অভিধানে থাকবে না। যে সমস্ত জনগন বিচার ব্যাবস্থার সঙ্গে জড়িত তারা যদি তাদের কর্ম সততার এবং দায়িত্বের সাথে পালন করে তাহলে সত্যিকারের অপরাধীরা কারাবাসে থাকবে এবং যে কেউ অন্যায় করার দুঃসাহস দেখাবে না। অপরাধের হার কমবে। সৎ, খেটে খাওয়া, দায়িত্ব পরায়ন লোকেদের অধিকার সুরক্ষিত হবে। এর ফলে দেশে উন্নতি আসবে এবং জনগনের জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়ে উঠবে। ন্যায় সত্যকে স্থাপিত করে, আর সত্য শান্তিকে।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে - রজতজয়ন্তী বর্ষ

পরিমল চন্দ্র রায়
গ্রন্থাগার বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে অধ্যাবসায় হবে এটা অন্তত কুচবিহারের প্রান্তিক গ্রাম বোকালীর মঠ থেকে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষির ছেলেমেয়ের কাছে স্বপ্ন অথবা ভাবাটাও অন্যায় মনে হতো অনেকের কাছেই। অর্থবিদ্যায় সাম্মানিক-স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর কিছুটা আতঙ্ক এবং অনেকটা দুঃচিন্তা মনের ইছা ও স্বপ্নকে গ্রাস করছিল। পড়ার অনিশ্চয়তাকে মাথায় নিয়ে পদ্ধতিগত ভাবে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র পূরণ ও প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকার সুবাদে ভর্তি হলাম যথা সময়ে আমার শুভাকাঙ্খীদের আর্থিক বদান্যতায়। ভর্তির সময়েই জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে ২রা জানুয়ারী ১৯৯১ সালে। তাই এখানে আসার জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু করলাম, কারণ আসতে হবে ১লা জানুয়ারীতেই। আমার ইচ্ছায় ও অনেকের আন্তরিকতায় ভর্তি হলাম ঠিকই কিন্তু পড়াশুনাটা চালাবো কি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে পর্যন্ত চিন্তায় ছিলাম, রাতে ঘুম আসত না। বাবা-মা অবশ্য সর্বতভাবে পড়াশুনা করবার জন্য পাশে থেকে সাহস যোগাতেন আমাদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও। অর্থের যোগানের জন্য বলতেন 'তোর ভাগের জমি তুই বেচেয়া লেখাপড়া কর, তাও তোর মানষি হওয়ায় খাবে।' যাইহোক অবশেষে গাছ, একটি গরু বিক্রি করে লেপ-তোষক, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি পড়তে আসার জন্য ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন তা নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে ১লা জানুয়ারী ১৯৯১ স্থায়ী ভাবে পদার্পণ করি। স্থায়ী ভাবে বললাম এই জন্য, আসলে ঐ বিছানাপত্র নিয়ে আর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যাই নি। বিশ্ববিদ্যালয়েই আমার রজতজয়ন্তী বর্ষ পূর্ণ হল ছাত্রাবস্থা থেকে কর্মাবস্থা অর্থাৎ ১৯৯১-২০১৫ সাল পর্যন্ত।

১লা জানুয়ারী ১৯৯১ সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য তৈরী হওয়ার ব্যস্ততার সঙ্গে পাড়া ও গ্রামের অনেকই ভালোবাসা-শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ জানানোর জন্য বাড়ীতে হাজির। মনে হচ্ছিল যেন বিদেশে যাচ্ছি বা তীর্থে যাচ্ছি। আসলে আমাদের গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা প্রথম, হয়তো বা এজন্যই। যদিও সেদিনের আসার ব্যস্ততার অনেক আগে থেকেই আমাদের বন্ধুদের মদ্যে যারা সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসব, তাদের মধ্যে যোগাযোগ চলছিল। কারণ, আমাদের স্নাতক পরীক্ষার পর স্নাতোকত্তর পড়ার জন্য অনেকটা ফাঁকা সময় থাকত। পরে জানতে পেরেছিলাম পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কারণের জন্য স্নাতোকত্তর পড়ার শেসন পিছিয়ে গেছিল। তাই ঐ ফাঁকা সময়ে বাড়ীর কাছাকাছি বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ করেছিলাম পোষ্টকার্ডে বা সাইকেলে। মোবাইল, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি এখনকার মতো ই-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। ঐ-দিন সকাল সকাল গুছিয়ে নিয়ে অজানা-অচেনা একটা জায়গায় গেলে যেমনটা ভয় হয় সেরকম একটা ভয় ও দুঃচিন্তা নিয়ে খাওয়া সেরে সঙ্গে টিফিনসহ ছাত্রাবাসে খাওয়ার জন্য কিছু চাল, চিড়া, মুড়ি নিয়ে বাবা-মার আশীর্বাদ ও পাড়া-গ্রামের থেকে আসা উপস্থিত সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে অনেকটা

দূর মাটির রাস্তা অতিক্রম করে পাকা রাস্তায় বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম কুচবিহারের বাস ধরার জন্য। কিছুক্ষণ পর এন.বি.এস.টি.সি. একটি বাস আসলে সেখানে উঠে বসলাম এবং বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ও অন্যান্যরা হাত নেরে শুভেচ্ছা জানালেন, যেন আমার যাত্রা শুভ হয় ও আমার যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর কুচবিহার বাস-স্ট্যাণ্ডে বাসটি পৌঁছালে সেখানে বাস থেকে নেমে দেখি আমার দুই বন্ধু এখানে পড়তে আসা ইতিহাস বিভাগের বাণেশ্বরের মৃণাল ও খোল্টার রতন আমার ও আমাদের আর এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের সঙ্গে আমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ইচ্ছামারীর বিমল চলে আসল। তখন কুচবিহারের এন.বি.এস.টি.সি. নতুন বাস-স্ট্যাণ্ডে আমাদের মতো অনেক ছাত্র-ছাত্রীসহ অবিভাবক ও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার উদ্দেশ্যে অগণিত যাত্রী সাধারণ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করছে। তাদের অনেকেই নির্ধারিত টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিকিট কাটার জন্য। কেউবা তাদের বাস বিলম্বে ছাড়ার কারণে বিশ্রামাগারে ও আসেপাশে বসে আছে বা এলোমেলোভাবে ঘোরাঘুড়ি করছে। ঘোষক বিভিন্ন বাসের যাত্রাকাল ও রুট ধরে ধরে অনবরত ঘোষণা করে চলছিল। আমরাও শিলিগুড়ি আসার টিকিট কেটে নির্দিষ্ট বাসে উঠে সংরক্ষিত আসনে বসলাম। বাস যথাসময়ে ছাড়লে আমরা নিজেদের মধ্যে তাজা অতিত দু-তিন দিনের বাড়ীর অভিজ্ঞতা বিনিময় করছিলাম। চার বন্ধুর মধ্যে অন্ততঃ একটা দিকে মিল ছিল তা হল আমরা সকলেই প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে ও চাষি পরিবারের। এসব গল্পের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কী কী করব, কীভাবে চলব, কীভাবে থাকব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটা পরিকল্পনার নক্সা তৈরী করছিলাম। অবশ্য পরিকল্পনা করার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলাম আমাদের পরিচিত দু-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনি দাদার পরামর্শ, যারা ছাত্রাবাসে অতীতে দু-বছর থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাই দাদাদের পরামর্শগুলি আমাদের পরিকল্পনার নক্সাকে আরো যেন মজবুত করছিল অন্ততঃ সেই মুহূর্তে । এবং যে কোনো বিপদেই চার বন্ধুই যেন সংঘবদ্ধ থাকি এরূপ একটি সংকল্প নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন বাস টারমিনাস্ ও শিবমন্দির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকাল ঠিক চারটার দিকে পা রেখেছিলাম। ভর্তির সময়ই জানা ছিল আমাদের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ছাত্রছাত্রী এবং অনেকের অবিভাবকরাও ছাত্রাবাসের সামনে উপস্থিত, যেন উৎসবের মেজাজ তৈরী হয়েছিল। সামান্য কিছু কলেজ বন্ধুদের উপস্থিতি চোখে পড়লেও বেশীর ভাগই অপরিচিত ছাত্রছাত্রীর মুখ। আমরা বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে পৌঁছে ছাত্রাবাসের স্টুডেন্ট কমোন রুম -এর সামনে যেখানে অনেকেই জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের নম্বরের তালিকাগুলি দেখছিল, আমরাও সেখানে গিয়ে আমাদের জন্য সংরক্ষিত ঘরের নম্বরগুলি দেখে নিশ্চিত হলাম এবং ব্যাগ-বিছানাসহ নিজের নিজের রুমে প্রবেশ করলাম। আমার ছিল এস-৫, অর্থাৎ সাউথ ব্লোক এর গ্রাউণ্ড ফ্লোর-এ শুরু থেকে এক নম্বর দুই নম্বর করে পাঁচ নম্বর ঘরে।

জীবনের প্রথম বাড়ী থেকে এতদূরে বাবা-মা ও বাড়ীর লোকেদের ছেড়ে ছাত্রাবাসে থাকার আনন্দ, না কষ্ট, না চিন্তা, নির্দিষ্ট করে কোন কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিলাম না, অনেক চেনা-অচেনার মাঝে নিজেকে হারিয়ে যাচ্ছিলাম বারবার। রুমে ঢুকেই পরিচয় হল আমার রুমমেট এর সঙ্গে, সে আমার অনেক্ষণ আগেই ঘরে

এসেছিল। রুমমেটের নাম দিলীপ দে, কুচবিহার শহরেই তার বাড়ী এবং সেও অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। আমার রুমের পাশাপাশি অন্যান্য রুমের অধিকাংশ বন্ধুরাও সন্ধ্যার মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট ঘরে চলে এসেছে। ছাত্রাবাসের এক তলায় কিছু ও দুই তলায় থাকত আমাদের সিনিয়র দাদারা। তাদের অনেকেই স্টুডেণ্ড কমোন রুমের সামনে আমাদের নতুনদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছিলেন। পরে জানতে পারলাম তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব। ছাত্রাবাস পরিচালনার জন্য তখন ছিল সেন্টাল কমিটি এবং ম্যাচ কমিটি। তাছাড়া অনুরূপ অনেক কমিটি সেসময় ছিল। যাইহোক, ম্যাচ কমিটির দায়িত্বে থাকা কয়েকজন দাদা বাইরে বসেছিল চেয়ার টেবিল নিয়ে এবং নতুন ছাত্রদের তালিকা দেখে নাম মিলিয়ে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করছিল। আমি ও আমার রুমমেট দিলীপ একসঙ্গে ম্যাচ কমিটির দায়িত্বে থাকা দাদাদের কাছে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করলাম এবং আমাদের নাম ছাত্রাবাসে ভর্তির তালিকাবদ্ধ আছে কিনা তা মিলিয়ে নিলেন। নাম নথিভুক্ত করে হাতমুখ ধুয়ে রুমে বসে বাড়ী থেকে নিয়ে আসা টিফিন চিড়া-মুড়ি জল খেয়ে নিলাম। কিছুটা টিফিন রুমমেটের সঙ্গে বিনিময় করলাম। তারপর রুমের কাছাকাছি অন্যান্য রুমের নতুন বন্ধুদের ঘরে গিয়ে পরিচয় হলাম। অনেকে আবার আমাদের রুমেও আসল। এর মধ্যে সিনিয়র কিছু দাদা এসে ছাত্রাবাসে থাকার কিছু বুদ্ধি ও পরামর্শ এবং সাহস যুগিয়ে গেলেন। বাড়ী থেকে একসঙ্গে আসা বন্ধুদের একে অপরের ঘরে গিয়ে রুমগুলি ও অন্যান্য সব ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখে নেওয়া হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ডাইনিং হল -এর ঘন্টা বেজে গেল। রাত তখন সারে আটটা। পরে জানলাম শীতকালে রাতের খাওয়ার সময় ৮.৩০ থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত ডাইনিং হল খোলা থাকে। রুমমেটসহ আরও কয়েকজন একসঙ্গে ডাইনিং হল-এ গেলাম। ঢুকে দেখলাম চারিদিকে বড় মাপের ডাইনিং টেবিল এবং টেবিলের দুদিকে হেলান দেওয়া হাতল ওয়ালা বড় বড় ব্রেঞ্চ কাম চেয়ার, সেখানে চারজন করে বসা যায়। ডাইনিং টেবিলের উপর গামলা ভর্তি ভাত-ডাল ভরিয়ে রাখা আছে ও একটি জলের জগ। আমরাও একটি টেবিলের একদিকে বসলাম। এতবড় ডাইনিং টেবিলে এরূপ আয়োজনে অসংখ্য ছেলেদের সঙ্গে খাওয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যেই একটু পরে ডাইনিং -এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা এক বয়স্ক ব্যক্তি স্টিল প্লেটে খোপে খোপে রাখা ভাত, ডাল, সবজি ও ঝোলসহ এক খণ্ড বড় মাছের টুকরো দিয়ে গেলেন। পরে বুঝলাম ডাইনিং টেবিলে গামলায় রাখা ভাত-ডাল যদি অতিরিক্ত ভাত-ডাল কারো লাগে তবে সে নিজের মত করে গামলায় রাখা হাতা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিতে পারে। পাশের এক টেবিল থেকে এক দাদা ডাক দিল ‘পিসা’ এখানে ভাত লাগবে। আর এক টেবিলের অন্য একজন দাদা ডাকছে ‘সন্তোষ দা’ ডাল দিয়ে যাও। বুঝলাম যে বয়স্ক ব্যক্তিটি আমাদের টেবিলে ভাত-ডালের প্লেট দিয়েছিল সে হচ্ছে ‘পিসা’ এবং গামলায় ভাত কমে যাওয়ায় কম বয়সি এক রান্নার দাদা এসে ভাত ভরে দিয়েছিল সে হল ‘সন্তোষদা’। এক একজন করে রান্না করার সব দাদাদের কথাই মনে আছে কিন্তু সেদিনের ‘পিসা’ ও ‘সন্তোষদা‘ ডাকটা কোথাও ছাত্রাবাসের কথা শুনলে বা উঠলে আজও স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সে নাম দুটো। যদিও তাদের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়। আর দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করি পিসা, কি সন্তোষদা ভালো আছেন তো? বাড়ীর সবাই ভালো আছে? ইত্যাদি। তাদের কাছ থেকে প্রায় সবাই হারিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সুবাদে আমাদের মত দু-চারজন পুরানো আবাসিকদের দেখা হলে তারাও আনন্দ পায় এবং আমরাও স্মৃতি রোমন্থন করি। চাকুরী জীবনের শেষ পর্যন্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ থেকে আসা গ্রামীণ সরল মনে আবাসিকদের দিনের পর দিন সযত্নে ও অবিশ্রাম যেভাবে তারা সেবা করে যান তাতে সকল আবাসিকদের মনে থাকবেই তাদের সযত্ন সেবার কথা। তারা জানেন না পাশ করে ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে কে কোথায় গেল বা কে কেমন আছে। যাক্ সেদিনের মতো ডাইনিং টেবিলে খাওয়া সেরে বাইরের দু'দিকে সিমেন্টের কংক্রিটের বেসিনে সারিবদ্ধ জলের কলে হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম এবং প্রথম দিনের ক্লান্ত ও ব্যস্ততাময় জীবনের স্বাদ পূরণ করে আবার পরের দিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারীর প্রথম ক্লাসে যাওয়ার উৎকণ্ঠা নিয়ে সেদিনের মত রাত ১১টার দিকে বিছানায় ঘুমিয়ে পরলাম।

পরের দিন গ্রামীণ জীবনের ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস মত সূর্য উদয়ের পূর্বে বিছানা ছেড়ে প্রাথমিক কাজগুলি সেরে একটু জলখাবার সেরে দিনের আলোয় ছাত্রাবাসের আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় হলাম এবং পরে স্নান সেরে আগের দিনের মতো ডাইনিং টেবিল-এ সকালের খাওয়া সেরে আমাদের বিভাগের পরিচিত সহপাঠীদের সঙ্গে হিউমিনেটিস বিল্ডিং-এ আগে যেখানে এস.বি.আই. শাখা ছিল ঠিক তার উপরে অর্থনীতি বিভাগে পার্ট ওয়ান ক্লাসে উপস্থিত হলাম। অবশ্য এখন পর্যন্ত আমাদের বিভাগের ঘরগুলি অপরিবর্তিতই আছে। তখন পার্ট-ওয়ান এবং পার্ট-টু দুটো ইয়ার -এ ক্লাস হতো। এখনকার মতো সেমিস্টার ব্যবস্থা ছিল না। বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রোফেসর প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রোফেসর মানস দাশগুপ্ত, প্রোফেসর জগদীশ দেবনাথ, প্রোফেসর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রোফেসর জেতা সংকৃত্তায়ন, প্রোফেসর সঞ্চারী মুখার্জী ও প্রোফেসর হিল্লোল চক্রবর্তী। স্যার-রা একে একে পার্ট ওয়ান ক্লাসে আসলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বিভাগের প্রধান। একে একে আমাদেরও পরিচয় নিলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর ক্লাস রুটিন দিলেন। পরে বিভাগীয় প্রধান এবং মানসবাবু অনার্স লেবেল -এর এবং মাস্টার লেবেল -এর ইনট্রোডাকশন দিয়ে প্রথম দিনের মত ছুটি দিলেন। এরপর আমরাও বিভাগের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় বিনিময় করলাম এবং সঙ্গে সিনিয়র কয়েকজন দাদা-দিদিদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ হলে বিভাগে যাওয়ার প্রথম দিনের উৎকণ্ঠা কাটিয়ে ছাত্রাবাসে ফিরলাম।

১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯২ সালের বড়দিন পর্যন্ত দীর্ঘ দুটি বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রাবাস জীবনে অনেক কিছু অভাবের মধ্যেও দুঃখ কখনও স্থান পাইনি। বিভিন্ন মনের বন্ধুদের মধ্যে নিজেকে তৈরী, খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরিবেশ, সাংস্কৃতিক জ্ঞান চর্চা যেমন- আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, বির্তক, তাৎক্ষণিক অভিনয়, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ইত্যাদি। নবীন বরণের অনুষ্ঠান হতো ছাত্রাবাসের ব্লক ধরে সেন্টাল কমিটি পরিচালিত এবং ছাত্র সংগঠন দ্বারা বিদ্যাসাগর মঞ্চে। আমাদের সময় সরস্বতী পূজার প্রতিযোগিতা হতো ছাত্র ও ছাত্রী আবাসিকদের মধ্যে, পূজায় আলপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান, প্রসাদসহ ইত্যাদির মধ্যে প্রতিযোগিতা, ছাত্রাবাসের ব্লক ধরে ধরে বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে ভলিবল খেলার সময় যে আনন্দ, সবকিছু মিলে দুঃখের

ঠাঁই হতো না কারোর মধ্যে। একবার মনে আছে আমাদের ব্লকের অনুষ্ঠানে আমার তাৎক্ষণিক বক্তব্যের বিষয় ছিল - 'Room-mate as a wife'। এ ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ বা অভিজ্ঞতা কোনটাই ছিল না তবু চেষ্টা করেছি কিছুটা বলার। ভালো বলতে না পারার জন্য নিজেকে কিছুটা লজ্জা লাগছিল। তবে পরে সেটা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল কিছু করতে হবে। অনেক বন্ধু মিলে একসঙ্গে বসে কমোন রুমে টি.ভি -তে খবর শোনা, সিনেমা দেখা, ওয়াল্ড কাপ খেলা দেখা, ক্যারাম খেলা, খবরের, কাগজ পড়া ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের পড়ার অবসরের ফাঁকে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা আমার সারা জীবনে চলার রসদ । এছাড়া বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে কোন বন্ধুর ঘরে বসে তাস খেলা, যেমন- কল-ব্রে, ব্রে ইত্যাদি শিখেছি। ছাত্রাবাসে না থাকলে হয়তো তাসখেলা কোনদিন শিখতামই না। যে উদ্দেশ্যে ছাত্রাবাসে আসা সেই পড়াশুনার ব্যাপারে নিজেদের বিভাগের বন্ধু ও দাদাদের সঙ্গে নোট-পত্র থেকে সবকিছু বিনিময় হতো। বিভাগীয় বন্ধু বা দাদাদের মধ্যে কোনদিন কোন সকীর্ণ মনের ব্যবহারের ছোয়া দেখতে পাইনি। এছাড়া সকলের মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব ও ভাতৃত্বের পরিবেশ। মাসের শেষের দিন গ্রাণ্ডফিস-এর জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করতাম। আসলে মাসের প্রায় তিরিশটা দিন দানাহীন মুসুর ডালের ঝোল খেতে ভালো লাগত না। মজা করে অবশ্য রান্নার দাদারা বলত 'আরে এই ঝোল খেয়েই তো সবাই মানুষ হয়ে বেরিয়ে গেল'। যাক্ সারা মাসে যাই খাওয়া হোক না কেন সেটা যেন ম্যাচ কমিটি গ্রাণ্ডফিসের দিন পুষিয়ে দিত। সেদিন বিকাল থেকেই থাকত উৎসবের আমেজ। সাইণ্ড বক্স লাগিয়ে সবাইকে যেন জানানো হতো গ্রাণ্ডফিসের আয়োজনের খবর। কারণ, অনেকের বাইরে প্রোগ্রাম থাকলে যেন রাতের গ্রাণ্ডফিসের আয়োজনে যোগ দেয়। সেদিন বলতে গেলে পড়াশুনা হতোই না। ছাত্রাবাসে প্রায় সব ঘরেই থাকত আড্ডার মেজাজ। কোন ঘরে হয়তো খোস মেজাজে গল্প হচ্ছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে, কোন ঘরে কল-ব্রে খেলা হচ্ছে, ইত্যাদি। আবার অনেক ভোজন পিপাশু বন্ধুরা ডাইনিং হল -এর বেল পরার অনেক আগেই সেখানে হাজির হতেন পিসার দেওয়া প্রথম প্লেটটা পাওয়ার জন্য। সেদিনের মেনু থাকত এখনকার বিশেষ বিয়ে বাড়ির খাওয়ার মেনুর মতো। আর ডিনারের পরে বিশেষ ভাবে প্রত্যেককে দেওয়া হতো চেনচেলার সিগারেট। যারা সিগারেট খেত না তারাও সেদিন যেন সিগারেটের ফিল্টারের দিকটা দুই টোটে চাপিয়ে অন্তত দুটি টান দিয়ে ধুম্র ত্যাগের সুযোগ হাত ছাড়া করত না।

ছাত্রাবাসের দুটি বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলী, ছাত্রাবাস ছেড়ে শান্তিপুরে ঘর ভাড়া থেকে লাইব্রেরী সায়েন্স, এল.এল.বি. ইন্টার পর্যন্ত, বি.এড. পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী কর্মীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মাস্টার অফ লাইব্রেরী সায়েন্স পড়া এবং বর্তমানে স্থায়ী কর্মীর অভিজ্ঞতায় নেট পাশ সহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণা করার প্রেরণা ইত্যাদি বিষয়, যা লিখে শেষ করা যাবে না। যাক্ সুধী পাঠকদের আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলে শেষ করছি। আমরা যখন এম.এ. পার্ট - টু -এ উঠলাম, তখন পার্ট-টু -র আউটগোয়িং দাদাদের বিদায়বেলায় দেখেছি নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কি কান্নাকাটি। তা দেখে আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল। এক বছর পর অবশেষে আমাদের যখন বিদায়বেলা সময় হলো, বুঝলাম বন্ধু বিদায়ের কি কষ্ট, কি দুঃখ। আসলে দুটি বছরের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে অনেকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই নিবিড় হয়েছিল যে প্রিয়জনদের ছেড়ে দিতে বা চলে আসতে বড়ই কষ্ট হয়েছিল। মনে হতো অনেকের সঙ্গে আর হয়তো কোন

দিনই দেখা হবে না। আর সেটাই সত্যি। এখন তাই আমাদের আক্ষেপ হয়, তখন যদি মোবাইল থাকত তবে সারাজীবন বন্ধুদের সঙ্গে অন্ততঃ যোগাযোগের সূত্রটুকু থাকত। তাই খারাপ লাগে, শুধু মনে পরে তাদের কথা ও হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি। আর ভাবি স্বর্গীয় বাবা-মা-র 'তোর মানষি হওয়ায় খাবে' ঐ আদেশটির কথা। তাঁদের ভাবনায় 'মানষি' হতে পারলাম কিনা জানি না। শুধু ঐ আদেশ যথার্থ রূপায়নের জন্য আজীবন কর্তব্যের অবহেলা করব না তাঁদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে।

'ধরাদেবী'

শ্রী নরেশ চন্দ্র রায়, মুদ্রণ বিভাগ

ধরা দে ধরাদেবী, ধরণ-ধারণ করিয়া আসিত ধরিত্রীদেবী, সর্ব্বং সহা ভারবহা বসবাস করি বসুমতী, অসুর মধু-কৈটভের মেদ ধার করিসিত মেদেনী, জীবভূত স্থাবর-জঙ্গম ভূমিষ্ঠ হই বুলিয়া জন্মভূমি-মাতৃভূমি, অষ্টবসুর বস্তু বহন করিস বুলিয়া বসুন্ধরা, তামানলায় ধরিয়া আসিত ধরনী। তোর মহিমা বুঝা বড় ভার, সময়-অসময় নাই, রাত-বিরাত নাই, কাল-অকাল নাই, তাল-বেতাল নাই, পূজা-পার্ব্বণ নাই, তোর কতকক্ষণ কি খামখেয়ালীপনা, বুঝা বড় দুষ্কর । গত বিশ্বকর্মা থাকি কতবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিলো, তোর কুনয় মায়া-দয়া নাই, তুই হোলো নিদয়া হাতাস খওয়া বাও-চমকানী। তোক কয় ভূমিকম্প, আর্থকুয়িক আর বোলে ভৈষাল যায় । ধরাদেবী ধরা দে, তোক হামেরা ধরিবার জন্য আসিছি, যেমন করি হোক, ছলে বলে কৌশলে।

ঠকিবার আসি নাই, ঠকেবার আসিছি, ধরাত যায় ঠিক করি ঠকেবার পারি তায় লাভবান, আর যায় ঠকেবার পারি না, তায় চিৎফাটাং। গোপাল তোর ধান ক্যানে থপাল, ধুরবারে কি আর কোবো, হের সমুদ্রে মোর কপাল। আগের সুকৃতিয় কাহ বড় লোক, কাহ ছোট লোক, বলন-চলন দোষ, কর্মদোষ, ভাগ্যদোষক দুষিয়া মুই কও মোর কপালতে নাই, মোর কপালখানে এই মতন। মুই কার ,মোর কায়, চলন বলন কর্ম, ভাগ্যৎ মিলিবে ভালো মন্দ। একেলায় আসিছু, একেলায় যাবার হোবে, সাধতখালি অশান্তির সংসার আগুনত পরিয়া অশান্তির দগ্ধ। সামেলালে ভালো, না সামেলালে বেসামাল, অশান্তিয় অশান্তি। মুই নিজে অশান্তি নাচালে কি হোবে, প্রকৃতিয় বাধ্য করাবে অপর্যার নগৎ ডাঙাকাঁচাল, ঝগড়া কাইমাই দ্বন্দ্ব, তুই মোর থাকি বেশী বুঝিস। জগত্তত এমন মানসি আছে যা উগ্রমুর্ত্তি মধুমাখাবাণী কোন্দল কোন্দলীনি। কাঁচাল ঝগড়ার স্বভাব না করিলে ভাতপানি হজম হয় না।

অশান্তির রোল টিভি, রেডিও, খবরের কাগজত, বাড়িবাড়ি, পাড়াপাড়া, সমাজ, মাঠ ঘাট, হাট বাজার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, কোর্টকাচারী, আইন আদালত, রাজনীতি, কুটনীতি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, সালিশি সভা এমনকি নিজ রাজ্য, নিজ সংসারত। ক্ষমতার লোভ, সম্ভবক অসম্ভব করা, অসম্ভবক সম্ভব করা যায় ক্যামন করিয়া। ধনের বল, মনের বল ও জনের বল ভোট কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক, ব্যাক্তি-কেন্দ্রিক সবার সমান অধিকার। স্বার্থ সুযোগ সুবিধা ছাড়া হামার যোগাযোগ ছিন্নভিন্ন অবিশ্বাস সর্ব্বনাশ। জ্ঞানের মতন পবিত্র নাই, সন্দেহের মতন সর্ব্বনাশ নাই। জ্ঞানরূপ অস্ত্র দিয়া মূল উচ্ছেদ করিয়া দিলে সগারে ভালো। হারামী বাদরামী স্বার্থবাদী ইতিরামি বেশী, ইতরের মরণ চিতর, উপজলিয়ার মরণ টিপিরিত। আগের ঝাঁল মিটিয়া ন্যাও, তমরা ক্যামন করিস্যান, তমার আগাপালি , হামার পাছাপালি পালাটিয়া রঙ্গতামাসা।

গোবিন্দের অলৌকিক পরিবর্তন নাকি রাজনীতির পরিবর্তন বুঝা বড় দায়। যায় যার সদস্য ভক্ত, তায় বুঝে তার মর্ম ঐটায় উয়ার ভক্তি বা ধর্ম। পুরাণত কয়, ওরে মন কায় ক্যামন করি ধরি ধন, সেইটা জানে ধরান্দারের ধান্ধাবাজ মন। আগচায়া বান্ধ্যে আলি তায় খায় শোলবহালী। অশান্তির শান্তি

হোবে যদি তুষ্টির দুইটা বেটা হর্ষ আর দর্পর মতন বেটা নাহয়। পুরাণত দক্ষরাজের ৬০টা বেটি, ১টা দিসে শিবক, ১৩টা দিসে কাশ্যপ মুনিক, ২৭টা দিসে চন্দ্রক, ১১টা দিসে রুদ্রক আর ৮টা দিসে ধর্মক। ধর্মর ৮টা মাইয়া যথা--শান্তির বেটা সন্তোষ, পুষ্টির বেটা মহান, ধৃতির বেটা ধৈর্য্য, তুষ্টির বেটা হর্ষ আর দর্প, ক্ষমার বেটা সহিষ্ণু, শ্রদ্ধার বেটা ধার্মিক, মতির বেটা জ্ঞান আরবায় কিকোম স্মৃতির বেটা জাতিস্মর। ইমিরা বাদে আরেকজন আছে উয়ার নাম ভিন্ন মূর্ত্তি নাম্মী। ইয়ার দুইটা বেটা, বলি আর নর-নারায়ণ, দুইজনে ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম-পরায়ন।

ধরা ধামত অফুরন্ত বাহ্যিক বস্তু, লুটিয়া পুটিয়া খালেও ইয়ার শেষ নাই। জল, আলো বাতাস স্বর্গের দেবতা অকাতরত দান করে। শেষ হোলেই নয়া জিনিষপাতি, শুভ কামত আগত কলর পাত, এলা হৈসে শালপাতা, থারমোকল থালা বাটি গ্লাস। রং বেরং চক্‌মক্ ঝলঝল মলমল জোলোলোইপুরী প্যান্ডেল আর ডিজের বুক ধরফরানী বাজন নাচন কুদ্দন।

ধরাদেবীর কতয় দুঃখ, নিরলে বসিয়া কান্দিবার ধরিসে, দুঃখে ধরাদেবীর গাওখান কাঁপিবার ধরিতে কম্পন হঞা ভূমিকম্প আর্থকুয়িক হবার ধরিসে। জগৎবাসী আতঙ্ক, স্বর্গের দেবতা অবাক, ইন্দ্রদেব, সূর্য, চন্দ্র, বরুন, পবন, অগ্নি, যম, যক্ষ-রক্ষ যতদেব ধরাধামত আসিয়া হাজির। ইন্দ্রদেব মর্ত্ত্যধামত ধরাদেবীক কহিল, ধরাদেবী তোর দুঃখটা কোনঠে, কিসের তোর নাক-মুখ-চোখের থ্যানথ্যানানী। তোর ধত্তির বুকত বসিয়া কায় বেশী মান সন্মান-হানি করিয়া বসুমতীর ধন-দৌলত লুটালুটি করি খায়। মুই ইন্দ্র অদম্য অপরাজিত মর্ত্ত্যধাম্যার সগারে দুঃখ যদি নিবারণ করিবার পার তাহোলে তোর দুঃখটা মোরঠে কিছুয় নাহয়।

ধরাদেবী বসুন্ধরা বসুমতী ধরনী স্যাল্যাম-স্যাট্যাম করি ইন্দ্রদেবক কয়, হে ইন্দ্রদেব মোর দুঃখ নিবারন করিবো, মোর ১২টা দুঃখ। দেবগিলার কপালত হাত, হায় কপাল, কপালীর কপাল, দুঃখিয়ার দুঃখ, সুখিয়ার সুখ, মস্তানীর মস্তান, নেতার নেতা। থাকের উপর থাক, তার উপর কালা কুত্তা, তার উপরত বাঘ। শেষ নাই, শেষ কোনঠে, শেষ হৈল পরমীশ্বরত। তাহোলে দেবগিলা মোর দুঃখলা মন দিয়া শুনিব্যান, কৃষ্ণ-সেবাদ্বেসী, হরি-নিন্দাকারী, সুরাগামী, বেশ্যাগামী, পাপাচারী, স্ব-ধর্ম্ম-বিহীন, বাপ-মাও ভক্তিশুন্য, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ক্রিয়াকর্ম্ম বিবর্জ্জিত ব্রাক্ষ্মণ, অথিতি-শুশ্রুষা-শুন্য আর অশুদ্ধ হৃদয়। হে ধরাদেবী নমস্কার, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, কৈলাস আর আকাশমন্ডল দিক-বিদিক বান্তর-অবান্তর নক্ষত্র নিত্য। বাকি সব অনিত্য, দিলেক বিধি, নিলেক বিধি, চল সগায় মিলিয়া বিধিলোক যাই। মিলিমিছি করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। গুরুর ড্যাড্যাং ড্যাংড্যাং।

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে।।

গল্প হলেও সত্যি

দেবাশীষ চক্রবর্তী
মুদ্রণ বিভাগ

সকাল ৬টার সাইরেনে ঘুম ভেঙে যায় আশীষের। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। রাতে ঘুমও ঠিক-ঠাক হয়নি। কি যেন একটা স্বপ্নের আকারে শুধু তার চোখের সামনে সারা রাত ধরে ভেসে বেড়িয়েছে। ও বিছানার ওপর থম্ ধরে বসে থাকে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বেড়িয়ে আসে এবং ও ভাবতে থাকে - শিক্ষা-দীক্ষায় কোথায় ও ভুল করেছিল যে ওকে আজকে বাবা-মা ছেড়ে এতদূর দিল্লীতে এসে একটি কোম্পানিতে মাসিক ১৬০০০ টাকার চাকরী করতে হচ্ছে। ওই টাকার মধ্যে ১০/১২ হাজার টাকা তার বাড়ি ভাড়া এবং কোনরকমে পেটে দিয়ে দিন গুজরান করতে চলে যায়। তারপর মাত্র তিন-চার হাজার টাকা সে বাড়ীতে পাঠাতে পারে। যদিও ওর মা-বাবা বারবার বলে তোর মাত্র এই কটা টাকা থেকে পাঠাতে হবে না, আমাদের পেনশনের টাকায় কোনরকমে চলে যাবে। কিন্তু আশীষের মন মানে না - তাই ঐ সামান্য কটা টাকা পাঠিয়ে মনকে শান্তি দেয়।

আশীষের জন্মের পর ওর বাবা-মার মনে হয়েছিল যে এ ভগবানের আশীর্বাদ এবং বড় হয়ে ও অনেক বড় একজন মানুষ হবে তাই ওর নাম রেখেছিলেন আশীষ। আশীষ পড়াশোনায় খুব একটা খারাপ-তো ছিল না। পরীক্ষায় বরাবর ভালো ফলই করেছে। হ্যাঁ তেমন কোনো কোচিং না নেওয়ার জন্য ওর জয়েন্টের র‍্যাঙ্কিং খুব ভালো হয়নি। কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ও সাফল্যের সাথে মাস্টার ডিপ্লোমা পাশ করেছে । আশীষ ভেবেছিল মা-বাবার একমাত্র ছেলে হওয়ার দরুন মা-বাবাকে ছেড়ে অনেক দূরে না গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি যদি কোনও সরকারি চাকুরী পাওয়া যায় তাহলে আর দুঃখ থাকবে না। ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু চাকুরী পাওয়ার অভিজ্ঞতা যে এত রূঢ় হবে তা ও ভাবতেও পারেনি। কোন একটি সরকারী চাকুরীতে লেখা পরীক্ষা, টাইপ টেস্ট এবং তারপর ইন্টারভিউ সাফল্যের সাথে পাশ করার পর ওর প্যানেলে নামও উঠেছিল কিন্তু যখন কল্ লেটার এলো না তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, ওর যায়গায় অন্য একজনের সেই চাকুরীটা হয়ে গেছে। তারপর ও মানসিক ভাবে খুব ভেঙে পড়েছিল। ও আগেই শুনেছিল যে আজকাল নাকি সরকারী চাকরী পেতে হলে শুধু ভালো ছাত্র হলে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুনাবলী থাকলেই হবে না, সবার আগে থাকতে হবে - বড় দাদা বা দিদির রেফারেন্স নতুবা মোটা টাকার জোড়। আশীষ এইব্যাপারে একদমই জানতো না তা নয়, কিন্তু ও ভেবেছিল ও গুলো মিথ্যা কথা - ভালো পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চয়ই একটি সরকারী চাকরীর ব্যাবস্থা করে নিতে পারবে, তাই অনেকে বললেও - ও কখনও কারোর পকেট ভরতে যায়নি বা কোনো দলে নাম লিখিয়ে নেতাদের মন জয় করার চেষ্টা করেনি।

আজ আশীষ ভাবে সেটা করলেই হয়তো ভালো হত। ওর জীবনের এতগুলো মূল্যবান সময় হয়তো নষ্ট হত না, বা হয়তো ওর জীবনটাও পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধবের মতো অনেক ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো। ওর শুধু মনে পরে যায় ওদের এক বান্ধবীর কথা - ওই বান্ধবী ওদেরকে বলত যে 'ও খুব শীগগিরি কোনো একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করবে' সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়ে আছে। আশীষ কোনোদিন বিশ্বাস করে নি, ভাবতো এরকমও আবার হয় নাকি। কিন্তু যেদিন

দেখলো যে সত্যিই ওই বান্ধবী একটি স্কুলের টিচার হয়ে গেল ও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আশীষ ভাবতে থাকে, আমরা এ কোন সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি? যেখানে নাকি সরকারি হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজে ভাল চিকিৎসা পেতে গেলেও কোনও বিশিষ্ট ব্যাক্তির রেফারেন্স দরকার হয়, না হলে ডাক্তার, নার্স সবার দয়ার পাত্র হয়ে থাকতে হয়। টাকার জোর থাকলে বিভিন্ন ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং এমনকি খুন করেও বাঁচা যায়।

একের পর এক নানা ভাবনা ওর চোখের সামনে ভিড় করে আসছিল। হঠাৎ আশীষের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠায় মনের ভিতরে চলতে থাকা ভাবনাগুলির তাল কেটে যায় - ও ফোনটা ধরে হ্যালো বলার সাথে-সাথেই ওর এক সহকর্মী বন্ধু বলে ওঠে কিরে পার্টি কবে দিচ্ছিস - তোর তো প্রমোশন হচ্ছে, আশীষ কিছুক্ষণ ঘোর কাটিয়ে বলে, কি সব ভুলভাল বলছিস। তুই কোথা থেকে শুনেছিস? ওর ওই সহকর্মী বন্ধু বলে আরে বন্ধু আমাদের কোম্পানীতে এই মূহুর্তে তোর মত যোগ্য ও দক্ষ কর্মী আর কেউ কি আছে, অতএব এই খবরটা সত্যি তুই মিলিয়ে নিস। আশীষ বলে ঠিক আছে তা'হলে পার্টি হবে - চিন্তা করিস না। ও মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়, ওর চোখে জল চলে আসে আর ও বিড় বিড় করে বলতে থাকে, ভগবান আমার দিকে এতদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন, আমার শিক্ষা বিফলে যায় নি। আমি লড়াই চালিয়ে যাব এবং সৎ পথে থেকেই মাথা উচু করে বাঁচবো।

বাসান্তরের পথে!

মহেশ গোপ
প্রাক্তন কর্মী, গ্রন্থাগার বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

জীর্ণ গলির মত সরু রাস্তা
বুক চিড়ে চলে গেছে
গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে।
দু-ধারে সারি সারি তরুদল
নীড় বেঁধেছে, নানা রঙের পাখি,
তারই ছায়ায় বিশ্রাম নেয়
বহু পথচারী।

একদা বড় বড় করাতের আওয়াজে
পাখিরা ঘুমহীন।
দেখছে, পড়ছে বড় বড় তরুদল
গাছেদের চোখে তুমি দেখনি
দুঃখ মেশানো আঁখিজনে।
আঁখি জলে ভ'রে তরু।
করে বলাবলি
কোথা গেল, কোথা গেল
প্রেমের কাকলি।

করাতের আওয়াজ, পাখিদের বুঝিয়ে দিল
বাসান্তরই কাম্য এখন-
এখানে তৈরী হচ্ছে
বাবুদের যাতায়াতের জন্য রাজপথ
যেখানে শান্তি বিরাজ করবে!

‘আতঙ্ক’

প্রতাপ ভট্টাচার্য্য, স্বাস্থ্যবিভাগ

২৫শে এপ্রিল ঐ দিনটা ভুলবে না আর কেউ,
থাকবে মনে এপ্রিলেরই ২৬, ২৭ কম্পনের ঢেউ,
কাঠমান্ডু উৎসস্থল ছাড়লো নাকো ভারত ভূতল,
কাপিয়ে দিল চিন, বাংলাদেশ ও আরও কত দেশের মাতৃভূমির স্থল।

নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ, চিন আতঙ্কে কাটল সব মানুষেরই দিন।
রাত পোহাল মাঠে ঘাটে ফিরবে না কেউ আপন ফ্ল্যাটে।
কম্পনেরই তীব্রতা যদি বেড়ে যায় গভীর রাতে,
পরিবার নিয়ে সাথে আতঙ্কে কাটল ক'দিন।

মনে পড়লেই আঁতকে ওঠে কম্পনের ঐ দূর্দিন
ভুলতে গেলেও ভুলতে দেয়না আফটার শকের চিন্তা
মরন-বাঁচন লড়াই এত উপরওয়ালা জানতা
আফটার শক প্রতিদিনই হচ্ছে যে নেপালেতে
কমছে না-কো আতঙ্ক বেড়েই যাচ্ছে দিনে রাতে।
মাঝে মধ্যে তীব্র হচ্ছে কম্পনের তেজ্
ছাড়ছে না-কো পিছন মোদের - করবে নাকি শেষ?

ভূমি পূজো হচ্ছে দেশে চেতন এল অবশেষে,
কমিয়ে দে মা কম্পন, করব নাকো ভুল কক্ষনো,
থাকবো না আর উচ্চতলে, করবো বাড়ি সমতলে।

সবার শেষে বলে রাখি ভয় পেয়োনা কেউ,
ভয় পেলে শুধুই বাড়বে আতঙ্কেরই ফেউ।
বহু জীবন চলে গেল প্রকৃতির এই দুর্যোগে,
তাদের প্রতি থাকলো শ্রদ্ধা ভারতবাসীর অন্তরে।

'কেরানী'

শম্ভু দাস,
সোসিওলোজি বিভাগ, উঃ বঃ বিশ্ববিদ্যালয়

ছোট ছিলাম ভালো ছিলাম,
ছিল অনেক স্বপ্ন।
বড় হয়ে পেলাম আমি
অন্য এক কর্ম।
যে কর্মে পরে আমি
হয়েছি একটু অকর্মন্য,
লোক ছাড়া চলে নাকো
আমার দু-দন্ড।
আবার অনেক সময় অনেক কথা,
যায় না করা সহ্য।
প্রতিকদের রুপ নিলে
পাল্টা আসে প্রশ্ন,
প্রশ্নের সে ভিন্ন ভিন্ন রুপ
পেরে উঠা যায় না কো।
মাঝখানেতে পড়ে আমি
তাই, কথার খোঁচায় বিদ্ধ।
কলমের খোঁচা আমারই হাতে,
বাকি সবটা অন্যের কাছে।
সব কাজ করি আমি
নামটা তবু-ও নেইকো,
অন্যেরা সব একটু করেই
দেখায় বহু ক্লান্ত।
দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা,
চলছে আমার হাতটা।
তার পরেতেও রক্ষা নেই,
অর্ডার হয় অনেক কিছুই।
এগুলো সব মাথায় রেখে
রি-কল করি মাঝে মধ্যে।
এ তো হল কর্মের জায়গা,
তারপরেতেও আছে সংসারের ঝামেলা।
একই নিয়মে বাধা আছে
সবার মতো আমার জীবনটা।
তাইতো আমি বলি নিজে
কেরানী হলাম কিসের জন্যে?
পরের বার-টা দেখো...........................,
হই যেন অনন্য।

বৃষ্টি

পার্থ বিশ্বাস
পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগ

শুধু বৃষ্টির জন্যেই জমিতে ফসল ফলেনি,
শুধু বৃষ্টির জন্যেই কৃষকের লাঙ্গল চালানো শুকনো মাটিতে,
মেলেনি একটুকুও জলের আভাস।

সূর্যের প্রখর তাপে ফসলের জমি ফুটি ফাঁটা,
চাষীদের হাহাকার, অনাহারে থাকব আবার,
হায় !!!   জল ???

শুধু বৃষ্টির জন্যেই খাল, বিল, নদী, নালা জলে ভরে উঠেছে,
ভেঙ্গে গেছে বাঁধ, রাস্তায় জমেছে জল,
এলাকা বানভাসি, মানুষের হাহাকার, ভেসে গেছে বাড়ি ঘর,
ক্ষুদার্ত মানুষের আশ্রয় মিলেছে স্কুল ঘরে,
সঙ্গে পশু পাখির বসবাস - মেলেনি আহার।

শুধু বৃষ্টির জন্যই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়েছে,
প্যাসেঞ্জারেরা আটকে পড়েছে কম্পার্টমেন্টে,
প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে যাত্রীরা করে ঠেলাঠেলি -
হকারের চিৎকারকেও চাপা দিয়েছে বৃষ্টির আওয়াজ।

শুধু বৃষ্টির জন্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল - কলেজে যেতে পারেনি,
তারই মধ্যে কেউবা ভিজতে-ভিজতে পৌঁছেছে স্কুলে,
স্কুলে বেজে উঠেছে ছুটির ঘন্টা, আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফেরা -
কিশোরেরা ফুটবল নিয়ে আদুল গায়ে নেমে পড়েছে মাঠে,
কিশোরীরা মেতে উঠেছে ঘরের কোনে লুডো খেলায়।
শুধু বৃষ্টির জন্যেই !!!

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি।

<u>কার্যকরী সভার সদস্য / সদস্যা</u>

সভাপতি	:	শ্রী সজল কুমার গুহ
সহ-সভাপতি	:	শ্রী ভানু বসাক
সহ-সভাপতি	:	শ্রী স্বপন দাস
সম্পাদক	:	শ্রী সুমন চ্যাটার্জ্জী
সহ-সম্পাদক	:	শ্রী অপূর্ব পাল
সহ-সম্পাদক	:	শ্রী অমিত পাল
কোষাধ্যক্ষ	:	শ্রী আনন্দ কুন্ডু

গ্রুপ-ডি প্রতিনিধি	:	শ্রী বির্জু মল্লিক
মহিলা প্রতিনিধি	:	শ্রীমতি উমা বর্মণ

বিভাগীয় প্রতিনিধি	:	শ্রী পার্থ বিশ্বাস	শ্রী গোবিন্দ রাউত
		শ্রী গৌতম সরকার	শ্রী সনাতন বর্মন
		শ্রী শিবু দেব	জিয়াউল হক্
		শ্রী মানিক মাঝি	শ্রী আশিষ মজুমদার
		শ্রী রঞ্জিত তালুকদার	শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্তী
		শ্রী লুবাই হাঁসদা	শ্রী শচীন্দ্রনাথ সিংহ
		শ্রী রামকৃষ্ণ ঘোষ	শ্রী অমিত সরকার
		শ্রী সুপ্রতীম ঘোষ	
		শ্রী মহেশচন্দ্র সিংহ	

<u>পত্রিকা উপ-সমিতি</u>

১) শ্রী পরিমলচন্দ্র রায়, সম্পাদক
২) শ্রী অনুপচন্দ্র সিংহ রায়, যুগ্ম সম্পাদক
৩) শ্রী দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, সদস্য
৪) শ্রী নরেশ রায়, সদস্য
৫) শ্রী সুকুমার ঘোষ, সদস্য
৬) শ্রী মুনি বর্মন, সদস্য
৭) শ্রী রসিকলাল রায়, সদস্য
৮) শ্রীমতি ব্রততী ঘোষ, সদস্যা
৯) শ্রীমতি শ্রেয়সী চক্রবর্ত্তী, সদস্যা

Golden Jubilee year celebration

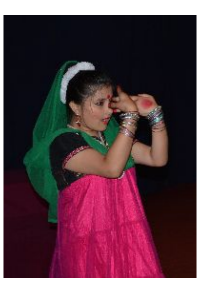

Golden Jubilee year celebration